কবি

বেলা তখন সাড়ে-আটটা, অবনীনাথ ব'সে আছেন তাঁর দোতলা লাইব্রেরি ঘরে। পরনে তাঁর শান্তিপুরি ধুতি, গায়ে গিলে-করা স্বচ আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে কার্পেটের চটি। তাঁর সামনের টেবিলটি ল্যাক্সারসে তৈরি, তার উপরে যে-ক'টা জিনিস আছে প্রত্যেকটার নিখুঁত ছায় পড়েছে বাদামি রঙের বার্নিশে। ঘরটি বেশি বড়ো নয়, বেশ জমা নিবিড় গোছের। মেঝে থেকে সীলিঙ পর্য্যন্ত হাজার হাজার বই, মাঝে মাঝে পৃথিবীর মহৎ কবিদের পাথরের ও ব্রোঞ্জের মূর্তি-কোণে-কোণে ছোটো-ছোটো টেবিল বসানো। পুবদিকে পাশাপাশি দুটি মস্ত নি জানলা; রোদ এসে বইয়ে ঠাসা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে তির্যক হ'য়ে চ'লে গেছে সীলিঙের মাঝখান দিয়ে। সমস্ত ঘরে বইয়ের একটা ঠাণ্ডা ও ঝাপসা গন্ধ; অবনীনাথের মাথার উপরে যে-পাখাটা ঘুরছে তার হাওয়াতেও যে কত হাজার বছরের সঞ্চিত সাহিত্যের সৌরভ।

পাশেই রয়েছে বিরাট ঐশ্বর্যময় ড্রয়িংরুম কিন্তু আজকের অতিথি অভ্যর্থনা অবশ্য লাইব্রেরি ঘর ছাড়া আর কোথাও হবে না। কবি ও সাহিত্যিক মৃগাঙ্ক আজ আসছেন তাঁর বাড়িতে। তিনি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, মৃগাঙ্কবাবু দয়া ক'রে সম্মত হয়েছেন। আজ সেই বহু প্রত্যাশিত দিন। মৃগাঙ্ক মিত্রের লেখা তিনি পড়েছেন বহুদিন ধ'রে যত পড়ছেন, ততই বেশি মুগ্ধ হচ্ছেন। অথচ এই লেখকের বয়সও বেশি নয়, তিরিশও নাকি হয়নি। আশ্চর্য্য! অবনীনাথ নিজে চল্লিশ পার

হয়েছেন, কানের উপরে দু'একটা চুল পাকতে শুরু করেছে। তাঁর ঐশ্বর্য তিন পুরুষের, বাগবাজার অঞ্চলে আছে তাঁদের পৈতৃক সাত মহলা বাড়ি। কিন্তু সেখানে তাঁর ভালো লাগে না; ল্যান্সডাউন রোডে তিনি নিজের পছন্দমতো এই বাড়িটি ক'রে নিয়েছেন। বাড়িটি আধুনিক ধরনের, সেকেলে জমিদার ঘরে জন্মেও মনটা তাঁর সম্পূর্ণ আধুনিক। ভাইদের মধ্যে তিনিই একমাত্র এম. এ পাশ করেন; বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি তাঁর অকৃত্রিম; পড়াশুনো ক'রেই তিনি এ-পর্যন্ত তাঁর প্রচুর অর্থ ও অবসরের সদ্ব্যয় করেছেন। সম্প্রতি লেখার দিকে একটু মন গেছে: অনেক ভেবে-চিন্তে খেটে-খুটে যে-সব সাহিত্যিক প্রবন্ধ তিনি লেখেন, তা উঁচুদরের সাহিত্যপত্র-গুলিতেই ছাপা হয়। কিন্তু এ-পর্যন্ত সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত মেলামেশার সুযোগ তিনি বড়ো একটা পাননি, প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও। কোনো-কোনো আড্ডায় গিয়েছেন দু'একবার; তাঁকে দেখেই সবাই কেমন শক্ত হ'য়ে গেছে, তিনিও বিশেষ আরাম পাননি। কোনো পক্ষেই ভদ্রতার ত্রুটি হয়নি, কিন্তু ভদ্রতার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্যেই সত্যিকার সংস্পর্শ কিছু ঘটেনি।

এতদিনে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হ'তে চলেছে; যে-লেখককে তিনি সব চেয়ে ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন তিনিই আসছেন আজ তাঁর বাড়িতে। সঙ্গে তাঁর একজন বন্ধুও আসবেন, তিনি সাহিত্যিক না-হ'লেও সাহিত্য বোঝেন ও ভালোবাসেন নিশ্চয়ই—কত বিষয়ে কত সরস, কত গভীর, কত কল্পনা-উদ্দীপক আলোচনা—অবনীনাথের মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হ'য়েই আছে। মৃগাঙ্ক মিত্রকে এর আগে তিনি দ্যাখেনওনি; সেই উজ্জ্বল সকালবেলায় বইয়ের গন্ধে ভরা হাওয়ায় একা-একা বসে

তিনি প্রত্যাশার ভাবটাকে উপভোগ করছেন। ন'টার সময় তাঁদে আসবার কথা।

এক আঙুল বাড়িয়ে তিনি একটা বেল্ টিপলেন। ঢুকলো বেয়ারা।

'ন'টার সময় আমার কাছে দু'জন বাবু আসবেন। তাঁরা এলে সোজা এখানে নিয়ে এসো।' ব'লে তিনি টেবিল থেকে একখানা ব নিয়ে খুললেন। বইখানা মৃগাঙ্ক মিত্রেরই, কবিতার বই। কতবা এ-বই পড়েছেন অবনীনাথ, কতবার নিজের মনেই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন 'সূর্যমুখী'র মতো কবিতা যে লিখতে পারে সে শুধু মহৎ কবি নয় মহৎ মানুষও। পাতাটা বার ক'রে অবনীনাথ মৃদুগুঞ্জনে কয়েকা লাইন পড়লেন। অদ্ভুত, আশ্চর্য।

কিন্তু পিয়ানোর মতো টুংটাং শব্দে আস্তে-আস্তে ন'টা বাজলো, বে পাঁচ মিনিট হ'লো, অতিথিরা এলেন না। কে জানে কেন দেরি হচ্ছে অবনীনাথ সেই বইটাতেই আবার মন দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অম আশ্চর্য কবিতাতেও মন বসলো না। টং ক'রে সওয়া-ন'টা হলো। অবনী নাথ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। বই রেখে উঠে দাঁড়ালেন, দু'একবার পায়চা করলেন, দু'একটা বই নাড়লেন। অতি দীর্ঘকাল পরে সাড়ে-ন'ট বাজলো। কোথায় কবি? অবনীনাথের মন একেবারে মুষড়িয়ে গেলো নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে সেজন্য তিনি আসতে পারলেন না অভ্যেসমতো টেলিফোন তুলতে গিয়ে মনে পড়লো মৃগাঙ্কের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

২

অবনীনাথ আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রায় পৌনে দশটার সময় এলেন প্রত্যাশিত অতিথি। বেয়ারা তাঁদের দু'জনকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো।

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন অবনীনাথ, কিন্তু মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো বুঝি কোনোরকম কিছু ভুল হয়েছে। দু'দিনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর আধ-ময়লা কাপড়ের আড়ালে আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রতিভা প্রচ্ছন্ন নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তা উপলব্ধি করতে মুহূর্তকাল দেরি হয় বইকি। অন্য ভদ্রলোকটি অপেক্ষাকৃত সুবেশ, চোখে চশমা—কিন্তু অবনীনাথের প্রবৃত্তিই যেন তাঁকে ব'লে দিলে কে তাঁর প্রিয় কবি।

'আসুন, আসুন,' করজোড়ে তিনি বললেন।

ধুলো-লাগা পুরোনো স্যাণ্ডেল চটপট করতে-করতে কবিপ্রতিভা এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। হেসে বললে: 'ইনি আমার বন্ধু রাজেন সরকার।'

রাজেনের দিকে ফিরে বিশেষ রকম মধুর হেসে অবনীনাথ বললেন, 'আপনি—'

বন্ধুর হ'য়ে জবাব দিলে মৃগাঙ্ক: 'না, ও লেখে-টেকে না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেজন্য,' ব'লে হেসে উঠলো।

একটু অপ্রতিভ বোধ করলেন অবনীনাথ। অতি-আধুনিক ছাঁচের দুটো আরাম-কেদারায় অতি-বিনয় ক'রে বসালেন অভ্যাগতদের, তারপর বললেন:

'আপনাদের দেরি হ'য়ে গেলো।'

'হ্যাঁ, দেরি হ'লো একটু,' মৃগাঙ্ক বললে। 'ট্রাম থেকে ঢের দূর কিন্তু আপনার বাড়ি।'

অবনীনাথের মনে আর একটা মৃদু আঘাত লাগলো। বাড়ির সুবিধের মধ্যে ট্রামের কাছে হওয়াও যে একটা এ-কথা এমন ক'রে কখনো তাঁর মনে হয়নি। মৃগাঙ্ক বললে: 'আপনি বসুন।'

'আপনাদের কত কষ্ট হ'লো এই রোদে। গাড়িটা পাঠিয়ে দিলেই হ'তো।'

'কিছু অসুবিধে নয়। ও-সব অভ্যেস আছে আমাদের।' মৃগাঙ্ক হাসলো, আর হঠাৎ অবনীনাথের মনে হ'লো অত সুন্দর হাসি তিনি কখনো ছাখেননি।

'আপনাদের জন্য একটু সরবৎ—'

'না, না, দেখুন, ও-সব কিছু—'হঠাৎ মৃগাঙ্ক মূর্তিমান ভদ্রতা হ'য়ে উঠলো।

'তবে একটু চা—'

'চা খেতে পারি। কিন্তু আপনি বসবেন না?'

'এই তো বসছি।'

'কেন ? কেন চলবে না ?'

'আমাদের মধ্যে কারো সঙ্গে তো কারো মিল নেই। তা ছাড়া, কেউ চাঁদাও দেবে না।'

অবনীনাথ যেন একটা ঘা খেলেন কথাটা শুনে। মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু একবার চেষ্টা করা যায় না কি ?'

'চেষ্টা আপনি করতে পারেন, কিছু খরচও না-হয় আপনি করলেন··· কিন্তু আপনার উৎসাহই বা কতদিন থাকবে ?' প্রশস্ত চেয়ারে আরাম ক'রে গা এলিয়ে দিয়ে মৃগাঙ্ক চারদিকে তাকিয়ে অন্য রকম সুরে বললে: 'সুন্দর বাড়িটি আপনার।' এ-প্রসঙ্গটাই যেন তার বেশি মনের মতো।

অবনীনাথ বিনীত ও লজ্জিতভাবে মৃদু হাসলেন।

'আপনার এই ঘরের মতো একটি ঘর পেলে কত লিখতে পারতাম, কত ভালো লিখতে পারতাম। এ-রকমই বা কেন—একটু নিরিবিলি, একটু চুপচাপ, পূবে এমনি একটি জানলা—আর কিছু বই—দরজা বন্ধ ক'রে বসতে পারি এমন একটি ঘর পেলেও হ'তো।

কথাগুলো খচ্ করে বিঁধলো অবনীনাথের বুকে। লোকপরম্পরায় তিনি শুনেছিলেন, আজকালকার লেখকদের দুরবস্থার কথা। লিখে সামান্যই পাওয়া যায়। কোনো সময় হয়তো পঞ্চাশ টাকাতেও কপিরাইট বেচতে হয়! কেউ ইস্কুলমাষ্টারি করে, কেউ করে কেরানিগিরি—হয়তো তা-ও জোটে না, কি জুটলেও টেঁকে না। এ নিয়ে অবনীনাথ অনেক ভেবেছেন। রীতিমতো দুশ্চিন্তা করেছেন, এটা তাঁরই জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যা যেন। এ-কথা ভাবতে যে যন্ত্রণার মতো লেগেছে তাঁর দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এমন মর্মান্তিকভাবে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এই দুর্গতি দূর করবার

জন্য একা ব'সে ব'সে অনেক প্ল্যান করেছেন তিনি, লেখকদের সিণ্ডিকে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, একটা লেখকদেরই চালিত মাসিকপত্র—কারে সঙ্গে ও নিয়ে আলোচনা করতে না-পেরে ও-সব ভাবনা মনেই মিলি গেছে। নিজে তিনি অকৃপণভাবেই সাহায্য করতে প্রস্তুত; কিন্তু সাহা কোন রাস্তা ধ'রে এলে সব চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয় ও পারস্পরি সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয় না তা ভেবে উঠতে পারেননি। আলাপটা যাতে সে দিকেই যায়, সে উদ্দেশ্যে তিনি বললেন :

'ঠিকই তো—আপনাদেরই তো নির্জনতা সব চেয়ে বেশি দরকার।'

এর পরে তিনি আরো কিছু বলতেন, কিন্তু মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি ব' উঠলো, 'সে-কথা ব'লে আর লাভ কী? তা একরকম অভ্যেস হ' গেছে—ছেলেপুলের চীৎকারের মধ্যে ব'সে বেশ লিখতে পারি আপিসের কাজের ফাঁকে-ফাঁকেও একটু-একটু লিখে ফেলি। সে যাকগে, এ-কথাগুলো যেন নেহাৎ-ই তুচ্ছ, এইভাবে মৃগাঙ্ক বললে, আপনার বে ঢের বই আছে, দেখছি!'

'নিষ্কর্মা লোকের একটা শখ আর কি,' সলজ্জভাবে বললেন অবনী নাথ।

'উঃ কত বই! এখানে আপনি দিন-রাত ব'সে পড়েন, না?' আশ্চ সরলভাবে বললে মৃগাঙ্ক। অকপট লুব্ধদৃষ্টিতে সে তাকালো মেঝে থেকে দেয়ালে, দেয়াল থেকে সীলিঙে।

এতক্ষণে অবনীনাথ একটু এগোবার সুযোগ পেলেন, 'এ-সমস্ত বই- আপনার মনে করবেন—যখন আপনার খুশি—'

মৃগাঙ্ক হাত নেড়ে বললে, 'সময় কই। ট্রামে যেতে-আসতে ছেঁড়া

৩

ঝকঝকে রূপোর ট্রে-তে চা এলো অতি মনোহর বিলিতি বাসনে। সঙ্গে বিচিত্র বিস্কুট, দেখলে অজীর্ণ রোগীরও খেতে ইচ্ছে করে। মৃগাঙ্ক নিজে চা ঢালতে গিয়ে উপচিয়ে ফেললো, তারপর চৌকো শর্করাখণ্ড গোটা চারেক ফেলে নিজের পেয়ালা তৈরী ক'রে নিলো।

'বাঃ, চা-টা তো চমৎকার!' আন্তরিক প্রশংসার সুরে ব'লে উঠলো সে।

অবনীনাথ বলতে আরম্ভ করলেন: 'আপনারা যে কষ্ট ক'রে আমার বাড়িতে এসেছেন এতে যে আমি কত সম্মানিত, কত সুখী—'

'ও-সব কিছু না,' মৃগাঙ্ক একখণ্ড বিস্কুটের মাঝখানে কামড় দিলে, গুঁড়ো ভেঙে পড়লো তার কোলের উপর। 'আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো, এটা আমাদেরও সৌভাগ্য।' কথাটা কৃত্রিম শোনালো, চেষ্টাকৃত শোনালো, যেন এ-ধরণের কথা ব'লে মৃগাঙ্কের অভ্যেস নেই। পরমুহূর্তেই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললে: 'আপনার বিস্কুটগুলোও চমৎকার। এত ভালো বিস্কুট কখনো খেয়েছি ব'লেই মনে পড়ে না। হণ্ট্লি পামার?'

অতিশয় লজ্জিতভাবে বললেন অবনীনাথ: 'একজন দিয়ে যায়। আচ্ছা, আপনাদের সাহিত্যিকদের মেলামেশা করবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা আছে কি?'

'না, তেমন আর কোথায়! এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে আড্ডা হয়, এই যা।' মৃগাঙ্ক বেছে-বেছে একখণ্ড রঙিন-চিনি-বসানো বিস্কুট তুলে নিলে।

'কিন্তু নিয়মিত মেলামেশা কি দরকার নয়? ভাবের বিনিময়—'

মৃগাঙ্ক প্রায় হেসে ফেলেছিলো, চেষ্টা ক'রে সেটাকে মুচকি হাসিতেই পর্যবসিত করলে। 'আমাদের সাহিত্যিকদের কথা ব'লে আর কী হবে!'

'কেন? আপনার মুখে এ-কথা কেন!' মৃগাঙ্কর কথাটায় একটা তাচ্ছিল্যের সুর ছিলো, যা রীতিমত পীড়া দিলে অবনীনাথকে।

কিন্তু ঐ সাগ্রহ প্রশ্নের কোনো জবাব না-দিয়ে মৃগাঙ্ক চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে-তুলতে তার বন্ধুকে বললে, 'কী সুন্দর পেয়ালাগুলো দেখছো, রাজেন?'

রাজেন বললে, 'ভারি সুন্দর!'

অবনীনাথ বললেন, 'আচ্ছা, কলকাতায় সাহিত্যিকদের একটা ক্লব গোছের করলে কেমন হয়? ধরুন, গোটা দুই ঘর রইলো, ছোটো-লাইব্রেরী—খাওয়া-দাওয়া হবে, গল্প-গুজব হবে, মাঝে-মাঝে দু'একটা সভাই না-হয় করা গেলো। আমার তো মনে হয়, সাহিত্যিকদের পারস্পরিক মেলা-মেশাটা একটা মস্ত কথা।'

তাঁর কথা ভালো ক'রে শেষ হ'তে-না-হ'তে রাজেন ব'লে উঠলো 'আপনার আইডিয়াটা চমৎকার, কিন্তু এ চলবে না।'

কথাটা একটু রূঢ় শোনালো অবনীনাথের কানে, প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তিনি মৃগাঙ্কর দিকে তাকালেন।

মৃগাঙ্ক সোৎসাহে বললেন, 'ঠিক এই কথাই আমি কতদিন ভেবেছি কিন্তু এ-ও ভেবে দেখেছি যে এ-ধরণের জিনিস ঠিক চলবে না।'

সবই সে একসঙ্গে জানবে। যেন খেলনার দোকানে শিশু, কোনোটাই ছাড়তে প্রাণ চায় না।

'এত বই তুমি কখন পড়বে?' বললে রাজেন।

'এমনি ক'রেই পড়তে হবে, নয়তো পড়াই হবে না। আপনার অ:ডেনও রয়েছে দেখছি, আর এটা বুঝি এলিয়টের নতুন? বাঃ—চেষ্টরটনের এই কলেক্‌টেড পোয়েম্‌স্‌টা কদ্দিন থেকে খুঁজছিলুম—' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো মৃগাঙ্ক। বইগুলো টেনে বের করতে গিয়ে ধুপ্ ক'রে ভেঙে পড়লো একটা সারি। 'ছি ছি—'

'তাতে কী হয়েছে, তাতে কী হয়েছে,' অবনীনাথ বার-বার বললেন।

'আচ্ছা, এ-কটা বই তাহ'লে—'

'নিশ্চয়ই। ওগুলো যাবে আপনার সঙ্গে, যতদিন খুশি রাখবেন।'

মৃগাঙ্ক কপাল কুঁচকে বললে, 'এতগুলো বই নিয়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়—'

'আমার গাড়িতে—'কথাটা ঠিক কী ভাবে বলবেন অবনীনাথ বুঝতে পারলেন না।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ কিছু নয়। আচ্ছা।' তিনজনে আবার যখন বসেছে, অবনীনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কবিতা লেখা প্রায় ছেড়েই দিলেন মনে হচ্ছে।'

'কবিতা! কখন লিখবো কবিতা?' একটু যেন উষ্ণভাবেই বললে মৃগাঙ্ক। 'তা ছাড়া লিখেই বা কী হবে—কেউ একটা পয়সা দেয় তার জন্য!'

কথাটা শুনে অবনীনাথ স্তম্ভিত হ'লেন। কবিতা সম্বন্ধে এম
শ্রদ্ধাহীন কথা তিনি কখনো শোনেননি। তবু এ-কথাও তিনি নিজেে
ভুলতে দিলেন না যে টাকার প্রয়োজন মৃগাঙ্কর খুবই বেশি। আে
বললেন: 'আপনার গল্প উপন্যাস অবিশ্যি চমৎকার, কিন্তু আপনা
কবিতা—'

মৃগাঙ্কর মুখে বেশ কালো হ'য়েই ছায়া পড়লো। —'আমার গল্পে
সাহিত্যিক মূল্য কী আছে না আছে জানিনে, কিন্তু তার যে মূল্যটা হাতে
হাতে পাওয়া যায় সেটা খুবই দরকারি। আর তাও বা কী এমন! পাঁ
শো কপি বিক্রি হয় না এদেশে। ভাবছি একটা ডিটেক্‌টিভ নভে
লিখবো এবারে।'

অবনীনাথ ভিতরে-ভিতরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে উঠে বললে
'আপনার কবিতার বইটি কেমন বিক্রি হয়েছে?'

'বিক্রি? টেনে-টুনে দেড়শো। পোকায় কেটেছে, এর পরে সেকে
এডিশন হবে।' ব'লে মৃগাঙ্ক উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

সে-হাসির শব্দ রীতিমতো পীড়া দিলে অবনীনাথকে। নিজের রচ
সম্বন্ধে কবির কি এইটুকু শ্রদ্ধা? আগের চাইতে ক্ষীণস্বরে তিনি বললে
'আপনার তো আরো ঢের কবিতা লেখা আছে। একখানা
হয় না?'

'একখানা! চারখানা হয়। পাঁচখানা হয়।'

'তাহ'লে—'

'কী ক'রে বই বেরুবে?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃগাঙ্ক বল
'অন্য বই লিখে টাকা পাই আর কবিতার বইয়ে টাকা ফেলতে হ

থোঁড়া পড়া—তাকে কি আর পড়া বলে। নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে-শুয়ে বই পড়বার আরাম—তা যেন ভুলেই গেছি!

অত্যন্ত লঘুভাবে কথাটা বললে মৃগাঙ্ক, প্রায় ফাজলেমির সুরে। তার-পর হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে দাঁড়ালো সে। —'চলুন আপনার বইগুলো একটু দেখি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমার লাইব্রেরি যদি আপনার কোনো কাজে লাগে,' নির্ভেজাল আন্তরিকতার সুরে অবনীনাথ বললেন, 'তাহ'লে আমি কৃতার্থ বোধ করবো।'

৪

লাইব্রেরিটা খুব আলগাভাবেও ঘুরে দেখতে সময় নেহাৎ কম লাগলো না। বিষয় অনুসারে তাকের পর তাক সাজানো; পুঞ্জীভূত বইয়ের সোঁদা-সোঁদা গন্ধে মৃগাঙ্কর প্রায় নেশা ধ'রে গেলো। যেখানেই সে দাঁড়ায় সেইখানেই তার সমস্ত জীবন কাটাতে ইচ্ছে করে। বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভ্রমণ, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব—কত-কিছু সে জানে না, কত-কিছু তার জানতে ইচ্ছে করে, কত-কিছু তার এ-জীবনে হ'লো না। নভেলগুলো সে বাদ দিয়ে গেলো, দাঁড়ালো কাব্য ও নাটকের সামনে। সফোক্লিস, হ্যাফো, শেক্‌সপিয়র, দান্তে…আজকের দিনের তরুণতম কবি পর্যন্ত।

'বইগুলো দেখেও কত সুখ!' সে মন্তব্য করলে।

'কবিতা আমার বড়ো বাদ নেই,' বললেন অবনীনাথ।

'এ থেকে গোটা দুই আমি যদি……'

'নিশ্চয়ই। যে ক'টা আপনার ইচ্ছা। আপনাকে পড়তে দেয়া মানে হচ্ছে বইকে সুদে খাটানো। হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট।'

কথাটা শুনে মৃগাঙ্ক হেসে উঠলো!—'স্বেন হেডিনের দু'একটা বইও নিতুম—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে…আর প্রোফেসর বীব-এর যে-বইটা দেখলুম…আর জোড-এর সেই নতুন বইটা…'

মৃগাঙ্কর তালিকা ক্রমশ বেড়েই চললো। সবই সে একসঙ্গে পড়বে,

রাজেন বললে, 'তোমার তো এইরকমই—বসলে আর ওঠবার কথা মনে থাকে না। তা এতে তোমার সাপ্তাহিক যদি বেরোয়—'

'পাগল! সত্যি-সত্যি ও টাকা দেবে নাকি ভেবেছো! এই—বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে একটু মেলা-মেশা—বড়োলোকের কত রকমই খেয়াল থাকে! তা বইগুলো পাওয়া গেছে বেশ।'

রাজেন মুখ টিপে হেসে বললে, 'ফিরিয়ে না দিলেও চলবে।'

১৩৪৩

দরজায় টোকা

ষ্টপের কাছাকাছি আসতেই বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেলো: 'ও মশাই আপনার পর্স ফেলে যাচ্ছেন যে!'

পিছনে তাকাতেই চোখে পড়লো সে যেখানে বসেছিলো ঠিক সেখানেই, তার পায়ের তলায় বলা যায়, ট্রামের মেঝেতে একটা বেশ বড়ো ব্রাউন রঙের একটা চামড়ার মণিব্যাগ প'ড়ে আছে। সামনের সীটের বুড়োমতো মোটা ভদ্রলোকটি মিট মিট ক'রে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যাগটা প'ড়ে গেলো যখন, টের পেলেন না। আচ্ছা ভুলো মন!'

আর-একজন বললেন, 'খুব কপালজোরে পেলেন যা-হোক!'

ট্রামের সমস্ত লোক তার দিকে তাকালো, কেউ বা অস্ফুটস্বরে দু'একটা মন্তব্য করলে। বিজয় নিচু হ'য়ে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নেমে গেলো, বুড়োমতো ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না।

মুহূর্তে তার কপাল ঘামে ভিজে গেছে।

এই মোড় থেকে একটুখানি হাঁটলেই তার বাড়ি, কিন্তু কিছুতেই যেন তার পা সরছে না, দু' এক মিনিট রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। তারপর বাড়ির রাস্তা ছেড়ে অবশ, অলসভাবে সোজা বড়ো রাস্তা ধ'রে হাঁটতে শুরু করলে।

প্রথম কথা হচ্ছে ব্যাগটা খুলে তার গহ্বরগুলো পরীক্ষা করা।

ফেলা মানে অবিশ্যি একেবারেই জলে ফেলা। তখন হাতে কিছু ছিলো, বের করেছিলাম, কিন্তু এখন…' মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লো।

'একখানা কবিতার বই বের করতে কত লাগে?'

'দুশো—আড়াইশো।'

অবনীনাথ চুপ ক'রে রইলেন। কী ক'রে তিনি কথাটা পাড়বেন? নাকি সোজা একটা চেক্ পাঠিয়ে দেবেন মৃগাঙ্ককে—দুশো টাকার, পাঁচশো টাকার 'দয়া ক'রে আপনার বাকি সমস্ত কবিতা একটি বইতে দেবেন।' 'আপনার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রত্যাশায় রইলাম'…কোনোটাই অবনীনাথের মনঃপূত হ'লো না। এখনই কি বলবেন কথাটা?

এই বিরতির ফাঁকে মৃগাঙ্ক কর্তব্যবোধে বললে, 'আপনার লেখা-টেথা তো দেখি মাঝে-মাঝে।'

'ওঃ, আমার লেখা—ও কিছু নয়। আমি কি লিখতে পারি! আপনারা কী ক'রে অত লেখেন তা-ই ভাবি।'

'অত লিখি কি আর শখ ক'রে।'

'কী ক'রে লেখেন! আমি যখন লিখতে চেষ্টা করি—কাটাকুটি, ছেঁড়াছেঁড়ি—দু'পাতা লিখতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। একটাকে পাঁচবার লিখে তবে একটা জিনিস দাঁড়ায়।'

মৃগাঙ্ক মুচকি হাসলো। সে-হাসিটা স্পষ্টতই ব্যঙ্গের। অবনীনাথ সেটা লক্ষ্য না-করবার চেষ্টা করলেন, কিছু মনে না-করবার চেষ্টা করলেন।

'আমাদের ঠিক সময়ের মধ্যে ফরমায়েস মতো লিখে দিতে হয়—হু-হু ক'রে না-লিখলে কি আমাদের চলে!'

অবনীনাথ মন-স্থির ক'রে নিয়ে বললেন, 'দেখুন, ভয়ে-ভয়ে একটা

কথা বলি আপনাকে। আপনি আপনার সমস্ত কবিতা একত্র ক'রে একটি বই বের করুন। খরচের জন্য ভাববেন না!'

মৃগাঙ্ক একটুও বিস্ময় প্রকাশ করলে না, কি সলজ্জ কৃতজ্ঞতার ভাবও দেখালো না। অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বললে, 'সমস্ত কবিতা বের করতে গেলে পাঁচশো টাকার কমে তো হবে না। সে-টাকার সঙ্গে আরো কিছু যোগ ক'রে বরং আসুন একটা ছবিওলা সাপ্তাহিক বের করি। খুব লাভ তাতে। আমার মনে সব প্ল্যান ঠিকঠাক আছে—একটু চেষ্টা করলে সামনের মাসেই বের করা যায়।'

তারপর মৃগাঙ্ক বিস্তৃতভাবে তার ছবিওলা সাপ্তাহিকের প্ল্যান উদ্‌ঘাটিত করলে।

বন্ধুকে নিয়ে মৃগাঙ্ক যখন উঠলো, তখন বেলা বারোটার কম হবে না। হিসেব ক'ষে, নক্সা এঁকে সে নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিয়েছে, মাত্র এক হাজার টাকায় কত বড়ো লাভের সাপ্তাহিক আরম্ভ করা যায়। এদিকে অবনী-নাথের এগারোটার মধ্যে খাওয়া অভ্যেস, ক্ষুধায় তিনি মুহ্যমান। ভেবেছিলেন ন'টা থেকে সাড়ে-দশটা পর্যন্ত দেড়ঘণ্টা পরম উপভোগ্য সাহিত্যচর্চায় যাপন করবেন, তারপর অবশিষ্ট দিনযাপন প্রথা-পথ ধ'রে চলবে। ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে ঘরে ফিরে আসতে-আসতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তাঁর।

গাড়িতে যেতে-যেতে মৃগাঙ্ক বললে, 'উঃ, কত বেলা হ'য়ে গেলো।'

কিন্তু সুমিতা তো নিশ্চয়ই বলবে—যাও, এক্ষুনি টাকাটা ফেরৎ দিয়ে এসো।

বাঃ, পাগল নাকি? ফেরৎ কি সে দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে—যেমন ক'রে পারে খুঁজে বের করবে ভদ্রলোককে। কী-সব বাজে কথা লোকে ভাবে! পারে নাকি কোনো ভদ্রলোক পরের টাকা রাখতে?

পারে না, না? তাই তো, ট্রামের ঐ ভদ্রলোক তো ব্যাগটা তার মনে ক'রে তাকেই ডেকে দিলেন, তুলে নিজের পকেটে তো রাখলেন না। সকলেই তা-ই করতো, সে নিজেও তা-ই করতো। পরের জিনিস কেউ কি ছোঁয়? ছোঁবার ভালোরকম সুযোগই বা আসে কোথায়? ঐ বুড়োমতো ভদ্রলোকের ব্যাগটা কুড়িয়ে নেবার তো উপায় ছিলো না অত লোকের চোখের সামনে। মনে করা যাক ট্রামে তিনিই একলা যাচ্ছেন, সামনে ঐ ব্যাগ, কণ্ডক্টর অন্য দিকে তাকিয়ে, তখন···? কিংবা মনে করা যাক ভদ্রলোককে তারই অবস্থাতে। তিনি কি ফিরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হতেন?

বিজয়ের তো কোনোই হাত ছিলো না। সে কুড়িয়েও পায়নি, তাকে জোর ক'রে গছানো হয়েছে। না-নিয়ে তার উপায় ছিলো না, বলা যায়। আর আস্ত কতগুলো দশটাকার নোট—কোনো ভয় নেই, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। দশটাকার নোটের তো কেউ নম্বর টুকে রাখে না। এ-কথা কি ভাবা যায় না যে এই দুর্দিনে ভাগ্য তাকে কিছু সাহায্য পাঠালো···অবশ্য সাহায্য পাঠাবার উপায়টা ঠিক রুচিসঙ্গত হয়নি।

ট্রাম থেকে নামার পর থেকে সারাক্ষণ তার বুকের ভিতরটা ধ্বকধ্বক করছে। কী অসম্ভব তেষ্টা পেয়েছে তার, বুকের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ

হ'য়ে গেছে যেন। বাড়ি ফিরতে হবে? কী বলবে সুমিতা? কেমন ক'রে বলবে সুমিতাকে? আচ্ছা, সুমিতাকে না-বললেও তো হয়। আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে কাল দশটা বাজতেই সোজা কোনো ব্যাঙ্কে। তার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট থাকবে, থাকবে টেবিলের টানায় চেক-বই, ঘষঘষ ক'রে চেক সই ক'রে দেবে পাওনাদারের হাতে। সুমিতা অবাক! কী গো, কোথায় পেলে এত টাকা? আপিসে মাইনে বেড়েছে, ছ' মাসের বাড়তি টাকা থেকে দিয়েছে একসঙ্গে। বাঃ, বেশ তো! চলো না ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাই। হ্যাঁ, গেলে হয়, সুমিতার শরীর তো মোটেই ভালো যাচ্ছে না।

বিজয়ের কেমন অদ্ভুত একরকমের হাসি পেলো। বাস্তবিক, কী-সব কথা মানুষের মনে হয়!

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হলো। সুমিতা উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'এত দেরি করলে যে? আমার যে কী ভাবনা হচ্ছিলো!'

তারপর, বিজয়ের অসাধারণ গম্ভীর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিতার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হ'য়ে গেলো।—'কী হয়েছে?' ক্ষীণ আওয়াজ বেরলো তার গলা দিয়ে।

'কিছু হয়নি। শোনো, কথা আছে,' ব'লে বিজয় ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। 'দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও, আলোটা জ্বালো।'

সুমিতা ও-দুটো কাজই করলে, কিন্তু কেমন ক'রে করলে বুঝতে পারলে না। তার হাত-পা কাঁপছে, সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে

খাতার শেষ পাতা

জিনিসটা যেন একটা বিরাট বোঝার মতো তার পকেটে ঝুলছে, কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না, যেন বহন করাও যাচ্ছে না। বিকেলের আলো ঝকঝক করছে চারদিকে, রাস্তায় লোকজনের অবিশ্রান্ত যাওয়া-আসা—কিন্তু তাতে কী? লোকে কি কখনোই পকেট থেকে ব্যাগ বের ক'রে রাস্তার উপরেই খোলে না? তার হাতটা একবার পকেটের কাছে গেলো, গিয়েই ফিরে এলো।

ঐ গলিটা খুব নিরিবিলি মনে হচ্ছে, বিজয় ঢুকে পড়লো। ছুটি মেয়ে গল্প করতে-করতে গেলো ট্রামের দিকে, একটা কুলি প্রকাণ্ড মোট মাথায় ক'রে নিয়ে চলেছে। বিজয় একটু দাঁড়ালো, কুলিটা মোড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তারপর হঠাৎ এক প্রচণ্ড চেষ্টায় সে টেনে বের করলে ব্যাগটা।

ব্যাগটায় অনেকগুলো খুপরি। প্রথমটায় গোটা তিনেক টাকা আর খুচরো পয়সা কিছু; তার পরেরটায় খানকয়েক ডাকটিকিট আর ভাঁজ-করা ছোটো ছোটো কয়েকটি কাগজের টুকরো—বিজয় তাও খুলে দেখলো, দোকানের ক্যাশমেমো, রসিদ, দু'একটা ঠিকানা—এমন বিশেষ-কিছু নয়—আর তারপর ভিতরের চেন-লাগানো গহ্বরটা খুলতেই ঝলসিয়ে উঠলো আদ্ধেক-ভাঁজ-করা চিক্কণ শ্যামল রঙের একতাড়া দশটাকার নোট। বিজয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস ক'রে উঠলো, তাড়াতাড়ি ব্যাগ বন্ধ ক'রে রেখে দিলে পকেটে। হঠাৎ তার এমন গরম লাগলো যেন সমস্ত শরীর জ্ব'লে যাচ্ছে।

অতি চমৎকার চেহারার, অতি চমৎকার কাপড়চোপড়-পরা একটি ভদ্রলোক একবার তার পাশে এসে বসেছিলেন। হাতে তাঁর কিছু সওদাপত্র ছিলো। ভদ্রলোকটি লেক রোডের মোড়ে নেমে গেলেন, এও

তার মনে আছে। কোনো সন্দেহ নেই এই ব্যাগের মা
তিনিই।

বিজয় মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগলো। যেন
কোনোখানেই পৌঁছবার তাড়া নেই।

কতগুলো টাকা হবে? দু'শো? চারশো? অনেক টাকা—অ
তার পক্ষে অনেক টাকা। সেই সুবেশ সুপুরুষের পক্ষে হয়তো বিশে
কিছু নয়। কে জানে! হয়তো ভদ্রলোক টাকা হারিয়ে এতক্ষণে পাগে
মতো ছুটোছুটি করছেন। হয়তো কারো অসুখের জন্যে টাকাটা এইম
তোলা হয়েছিলো, হয়তো বিদেশে কাউকে পাঠাতে হবে, হয়তো এ-টা
কোনো বিয়ের খরচা···হয়তো···কত রকম খরচ আছে টাকার, তার
কোনো কূল আছে! কে বলবে কার দরকার কত বেশি!

কে বলবে! হয়তো এ-টাকা কাল শনিবারের ঘোড়দৌড়ের মা
উড়তো, হয়তো গড়াতো চৌরঙ্গির পানশালায়, হয়তো আরো কো
অর্থহীন বুদ্ধিহীন বিলাসিতায় খরচ হ'তো। এদিকে এ-টাকাটায় পুজে
আগে হয়তো তার সমস্ত দেনা শোধ হ'য়ে যায়—সে আবার নতুন ভা
জীবনের সূত্রপাত করতে পারে—এর পরে আরো বেশি দুধ কিনে
পারবে হয়তো, রোজ কিছু ফল···সুমিতার শরীর ভালো যাচ্ছে ন
ডাক্তার বার-বার বলেছে বেশি ক'রে দুধ আর ফল খেতে।

কিন্তু দুধের বিল এমনিতেই পাহাড়প্রমাণ জ'মে উঠেছে, রোজ মা
তরকারি কেনবারই পয়সা থাকে না, ফল কি আকাশ থে
পড়বে? সুমিতা দিন-দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছে, ফ্যাকাশে হ'
যাচ্ছে।

না। স্বামীর এমন অদ্ভুত চেহারা সে আগে কখনো ছাখেনি। নিশ্চয়ই কোনো সর্বনেশে অঘটন ঘটেছে।

বিজয় ব্যাগটা বের ক'রে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললে, 'ছাখো এটা।'

'কী?' ফিশফিশ ক'রে বললে সুমিতা।

'ছাখো খুলে।'

সুমিতা অতি কষ্টে আঙুলগুলোকে শাসনের মধ্যে এনে ব্যাগ খুললো, প্রত্যেকটা খুপরি থেকে আস্তে-আস্তে সব জিনিস বের ক'রে রাখলে টেবিলের উপর। ফিকে নীল রঙের নোটের তাড়া চোখে পড়তেই সে বিহ্বলের মতো ব'লে উঠলো, 'এ সমস্ত···কী?'

বিজয় কিছু বললে না।

নিঃশ্বাসের স্বরে বললে সুমিতা, 'কুড়িয়ে পেয়েছো?'

'কুড়িয়ে পেতে বাধ্য হয়েছি।' বিজয় সংক্ষেপে বললে ঘটনাটা।

সুমিতা ঝুঁকে প'ড়ে নোটগুলো ছ'হাতে তুলে নিয়ে গুনলে। টেবিলের উপর কনুই রেখে সে দাঁড়িয়েছে, আলো পড়েছে তার মুখের আধখানায়; তার রোগা মুখের ভিতর থেকে বড়ো-বড়ো চোখ ছুটো যেন দপ্‌দপ্‌ ক'রে জলছে।

'কত?' জিজ্ঞেস করলে বিজয়।

'পাঁচশো—ঠিক পাঁচশো।'

'পাঁচশো!' তীব্র চাপা গলায় আর্তনাদের মতো শোনালো বিজয়ের কথাটা। 'ঠিক গুনেছ তো?'

আস্তে-আস্তে সুমিতা আবার গুনলে, 'ঠিক পঞ্চাশখানা নোট।'

পাঁচশো টাকা—নোটগুলো সব দশটাকার। প্রত্যেক পাওনাদারের

৯

প্রতিটি পয়সা শোধ হ'য়ে যাবে ; সেই যে বিয়ের সময় মামার কাছ থে
একশো টাকা নিয়ে এখনো দিতে পারেনি ; সেই যে সেবার ওষু
দোকানে পঞ্চাশ টাকা বাকি পড়েছিলো—সব। ব্যাটাদের তাড়ায় অ
হ'য়ে আছি। কিছুই হ'লো না, সুমিতা। জীবনের পথে কেবল চড়া
কেবল চড়াই—তারি মধ্যে একটু যে সবুজ কুঁড়ি ধরেছিলো, তাও
ফুটতেই ঝরে গেলো—ছেলেটা হ'তে-না-হ'তেই গেলো ম'রে !

এবার নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করা যায়, জীবনের নতুন স
পাতা এতদিনে বুঝি দেখা দিলো। ছুটিতে বেড়াতেও পারবে—শিলং…
পুরী…কি রাঁচি—কি সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য হবে সুমিতার, কী সু
হবে তারা !

দরজার কাছে চাকর হাঁক দিলে, 'মা, বাবুর চা এনেছি।'

বিজয় চেঁচিয়ে বললে, 'যাচ্ছি।'

সুমিতা সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এমন অদ্ভুত কাণ্ড কথ
শুনিনি। চলো, চা খাবে।'

বিজয় দাঁড়িয়েই রইলো। সুমিতার ভাবটা হঠাৎ যেন বড়ো উদাসী
বড়ো মহৎ হ'য়ে গেছে।

সুমিতাই আবার বললে, 'এই এক হাঙ্গামা! কার না কার টাকা
খুঁজে বের করো এখন তাকে।'

'হ্যাঃ! এত বড়ো শহরে খুঁজে বের করা সোজা কথা কিনা!'

'ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপন দেবেন।'

'হোঃ, তিন মাইল লম্বা সব কাগজের মধ্যে অতটুকু বিজ্ঞাপন কা
বা চোখে পড়বে! খেপেছো তুমি! তা ছাড়া বিজ্ঞাপন বেরুবেই

তার মানে কী ? ও গেছে যখন, পিকপকেটেই নিয়েছে, বিজ্ঞাপন দিলে সে-টাকাটাও নষ্ট।'

'তবে কী হবে ?' কথাটা বলতে গিয়ে সুমিতার কণ্ঠস্বর অদ্ভুতভাবে ভেঙে গেলো। বিকৃত, অসুস্থভাবে হেসে উঠেই সে থেমে গেলো। তার গালে এসেছে লাল আভা, চোখ দুটো শান-দেয়া ইস্পাতের মতো চকচক করছে ; তার সরু বুকের খাঁজে ছোটো শুষ্ক স্তন দুটি যেন হঠাৎ এক প্রচণ্ড আবেগের জোয়ারে ভ'রে গিয়ে ফুলে-ফুলে উঠেছে।

বিজয় বললে, 'কী আর হবে।'

কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই একেবারে স্তব্ধ, নিশ্চল। যেন এক অসহ্য বিদ্যুৎ-স্রোতে দু'জনেরই বুকের ভিতরটা জ্ব'লে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ বিজয় রুদ্ধস্বরে ব'লে উঠলো—'এটা কী ?'

ছোটো কাগজের টুকরাগুলোর মধ্যে একটা চকচকে মোটা শাদা কাগজ বিজয় হাতে তুলে নিলে। অতি সম্ভ্রান্ত চেহারার একটি ভিজিটিং কার্ড : এল, এম্, বোস, বি.-এ. (অক্সন), পি ২৮৩ডি লেক রোড।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই অসহ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ গেলো থেমে, শিথিল সাধারণ মুহূর্তগুলো ধীরে-ধীরে চলেছে কোনো এক অন্ধকার পাতালের দিকে। বিজয় সামনের চেয়ারটায় ব'সে পড়লো, হঠাৎ কী ক্লান্ত মনে হ'লো নিজেকে—কী অসম্ভব, অসম্ভব ক্লান্ত।

'কী ওটা ?'

বিজয় সুমিতার হাতে দিলে কার্ডখানা। একটু তাকিয়ে রইলো সুমিতা, আস্তে-আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার। তারপর একটা-একটা ক'রে সবগুলো জিনিস ব্যাগে তুলে রাখলো—ঠিক যেটা যেখানে

ছিলো। সবার শেষে তুললো নোটগুলো। আনকোরা নতুন নোট আজকেই বোধ হয় ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছে, মসৃণ, পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত, রাজা মাথা আর রাজপ্রতিনিধির সই নিয়ে প্রস্তুত—শক্তি, শান্তি, সুখ, জীবন নোটগুলো ভ'রে রেখে চেন টেনে দিয়ে সুমিতা ব্যাগ বন্ধ করলে।

তারপর বললে, 'চলো চা খাবে।'

বিজয় ক্ষীণ স্বরে বললে, 'এখানেই আনতে বলো।'

দরজায় আবার হাঁক পড়লো, 'মা, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।'

সুমিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো। হঠাৎ তার খেয়াল হ'লো এই সন্ধ্যে বেলায় ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকাটা বড়ই বিসদৃশ। দরজা খুলে দিয়ে বললে, 'রামলাল, এখানে নিয়ে এসো চা।'

চা নিয়ে এলো রামলাল। বিজয় ঢকঢক ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা এক পেয়ালা গলাধঃকরণ করলে। খাবার প'ড়ে রইলো।

'কিছু খেলে না?'

বিজয় মাথা নাড়লো। সত্যি কি খুব এসে যেতো? হয়তো ঘোড়দৌড়ের মাঠে, হয়তো ক্যাসানোভা রেস্তোরাঁয়, হয়তো নতুন কোনো নির্বোধ বিলাসিতায়। এদিকে সুনিতাকে দুধ আর ফল না-খাওয়ালে চেঞ্জে পাঠাতে না-পারলে……সে হয়তো বেশিদিন বাঁচবেই না। দিন দিন কী রোগা হ'য়ে যাচ্ছে।

সুমিতা বললে, 'শোনো, একটা চিঠি লিখে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও ভদ্রলোককে।' সুমিতার একটা উর্দ্ধশ্বাস-ভাব, যেন কী ভয়ানক বিপদে পড়েছে, কোনোরকমে উদ্ধার হ'তে পারলে বাঁচে।

'আজ থাক্ না।'

*

খাতার শেষ পাতা

'না, না, এক্ষুনি—এক্ষুনি লেখো তুমি, এই নাও কলম—লেখো, লেখো, আমি রামলালকে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' সুমিতার কথা বলার ধরন পাগলের মতো।

'চুপ ক'রে রইলে কেন? লেখো না।'

সম্মোহিতের মতো কলম তুলে নিলে বিজয়। দু' লাইন লিখলো। 'লেখো, "...কাল সকালে এসে দয়া ক'রে নিয়ে যাবেন" বললে সুমিতা। 'বেশ! এই হয়েছে।' কাগজটা তুলে নিয়ে খামে ভরে সুমিতাই ঠিকানাটা লিখলে, তারপর ডাক দিলে, 'রামলাল!'

রামলাল এসে উপস্থিত হলো।

'এই চিঠিটা নিয়ে এক্ষুনি যাও তো তুমি—লেক রোডে—ঠিকানা লেখা আছে—পড়তে পারো?'

রামলাল লজ্জিতভাবে, বললে 'আজ্ঞে কিছু-কিছু...'

'ওতেই হবে। এই চিঠিটা ওই বাবুকে দিয়ে আসবে। এল. এম. বোস, বাড়ির নম্বর পি ২৮৩ ডি।'

'আজ্ঞে বুঝে নিয়েছি।'

'খুঁজে বের করাই চাই। দেরি হয় হোক। পারবে না?'

'আজ্ঞে, এটুকু পারবো না!'

'তবে যাও এক্ষুনি। এই নাও—'

কাপড়ে হাত মুছে চিঠিটা তুলে নিয়ে রামলাল বললে, 'উনুনে—'

'সে-সব আমি দেখবো। তুমি এক্ষুনি যাও, দেরি কোরো না। খুব জরুরি চিঠি।'

'আজ্ঞে যাচ্ছি।'

গেলো রামলাল চ'লে। সুমিতা রান্নাঘরের দিকে যেতে-যেতে বললে
'তুমি ওঠো এবার, চান-টান করো, ভালো লাগবে।'

বিজয়ের ভিতরটা বড্ড ফাঁকা লাগছিলো, হঠাৎ যেন তার অনেক
ওজন ক'মে গেছে। উঠে দাঁড়াতে মনে হ'লো মাথাটা একটু টলছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রামলাল ফিরে এলো। সুমিতা জিজ্ঞেস
করলে, 'ঠিক দিয়ে এসেছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', ব'লে রামলাল পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের
করলে। তাতে নীল পেন্সিলে শুধু লেখা: 'অনেক ধন্যবাদ।' বিজয়
কাগজটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে দু' আঙুলে পাকাতে লাগলো।

ভদ্রলোকের বিশেষ যেন উৎকণ্ঠা ছিলো না। চিঠি পেয়ে এক্ষুনি
তো আসতে পারেন। কত হাজার টাকা হয়তো ব্যাঙ্কে প'ড়ে আছে
বিলেত থেকে এসে বিরাট চাকরি বাগিয়েছেন, পাঁচশো টাকা কী তার
কাছে? হয়তো ষ্টক-এক্সচেঞ্জের জুয়োখেলায় এক ঘণ্টায় পাঁচশো টাকা
কামিয়েছিলেন—বড়ো চাকুরেরা সকলেই গোপনে-গোপনে ও-কর্ম করে
এদিকে বিজয়ের রাশি-রাশি ধার, আর সুমিতার শরীর··· যাকগে।

যাকগে, যাকগে, যাকগে,। কতবার বিজয় বললে মনে-মনে। রাত্তিরে
সে কিছুই খেতে পারলে না, কিন্তু বিছানায় শুয়েই গভীর ঘুমিয়ে পড়লো
যেন কত রাত্রির অসুস্থ অনিদ্রার গভীর ঘুম নামলো তার চোখে।

বেলা সাতটার সময় সুমিতা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুললো।—
'ওগো, ওঠো তো, শিগগির ওঠো।'

খাতার শেষ পাতা

ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো বিজয়।—'কী হয়েছে ?'

'আর বোলো না। রামলাল এই সকালে উঠেই কোথায় গেলো? উনুন-টাতেও আঁচ দেয়নি। আমি ষ্টোভ ধরিয়ে চা তো করেছি, কিন্তু চিনি নেই। যাও না একটু, চার পয়সার চিনি নিয়ে এসো। চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।'

বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'রামলালটা এত বড়ো অসভ্য হ'লো কবে থেকে ? রোজ তো ঘুম ভাঙবার আগেই চা নিয়ে ডাকাডাকি করে।'

'কী জানি। এই চাকরগুলো সব হনুমান।'

গায়ে একটা জামা চড়িয়ে বিজয় চিনি আনতে যাচ্ছে, হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।—'শোনো!'

সুমিতা বললে, 'দেরি কোরো না। চা ঢেলেছি।'

'শোনো—রামলাল পালিয়ে যায়নি তো?' কেমন অদ্ভুত ফাঁকা-ফাঁকা শোনালো বিজয়ের কণ্ঠস্বর।

মুহূর্তে সুমিতার মুখ শাদা হয়ে গেলো। কোনো কথা না-ব'লে ছুটে গেলো রান্নাঘরে। সেখানে একটা দড়িতে রামলালের একটি কাপড় প্রায় সব সময়েই ঝুলতে থাকে, সেটা নেই। তারপর ঘরে ফিরে এসে টেবিলের দেরাজ ধ'রে টানলে, তারপর কাঠের পুতুলের মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিজয় স্ত্রীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে চুপি-চুপি বললে, 'কী হয়েছে?' সে জানে, সে জানে কী হয়েছে, তবু সে শুনতে চায়, শুনতে চায় সুমিতার মুখ থেকে।

'গেছে, নিয়ে গেছে।'

খাতার শেষ পাতা

'গেছে!' বিজয়ের বুক ফাটিয়ে যেন এই প্রতিধ্বনি কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে এলো।

কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই চুপ—তারপর পাগলের মতো খোঁজ খোঁজ—যদিও সুমিতা মনে-মনে নিশ্চিতই জানে ঐ দেরাজেই সে রেখেছিলো—তবু খোঁজ খোঁজ, বিছানা উল্টিয়ে, বালিশ ফাঁসিয়ে, বাক্স আলমারি দেরাজের সমস্ত তছনছ ক'রে সারা মেঝেতে ছিটিয়ে পাগলের মতো খোঁজ···তারপর বাড়ির দেয়াল ভেঙে দেখা আর নিজেদের পেট ছিঁড়ে দেখা ছাড়া খোঁজবার আর-কোনো উপায় রইলো না।

তারপর সেই কাগজ পত্রে কাপড়ে বিছানায় এলোমেলো ছড়ানো ছিটোনো মেঝেতে দাঁড়িয়ে দু'জনে দু'জনের দিকে বোবা পশুর মতো তাকিয়ে রইলো। একটু পরেই তো দরজায় টোকা পড়বে।

দৈবাৎ

১

হাওড়া ষ্টেশন

[বিভিন্ন কণ্ঠস্বর]

১। চাই পান—পান বিড়ি সিগ্রেট—পান বিড়ি সিগ্রেট।

২। (ঝুমঝুমি বাজিয়ে) চাই ঝুমঝুমি বেলুন বাঁশি ভালো-ভালো খ্যাল্না চা—ই!

৩। আরে তুই কোথায় যাচ্ছিস?

৪। যাচ্ছি না কোথাও···সী-অফ করতে এসেছি। আর তুই?

৩। আমি যাচ্ছি আসানসোল।

৫। মাসিকপত্র নেবেন বাবু, মাসিক পত্র? ভালো-ভালো নভেল, গল্পের বই···

[একটা ঠেলাগাড়ির শব্দ]

৩। বাস্‌রে, কত মাল যাচ্ছে!

৪। বোধহয় কোনো বুড়ো চাকুরে বদলি হ'য়ে চলেছেন।

৬। হাঁা, মশাই, গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলেন কেন? চোখে দেখতে পান না?

খাতার শেষ পাতা

৭। আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে ধাক্কা দিয়েছি, মশাই। অমন চ
কেন ?

৬। ইচ্ছে ক'রে যে ধাক্কা দেয়, তাকে বলে গুণ্ডা। আর ইচ্ছে ন
ক'রে যে ধাক্কা দেয় তাকে কী বলে জানেন ? উজবগ।

৭। আপনার কথার জবাব দিতে পারতুম, খুব ভালো জবা
দিতে পারতুম, কিন্তু সময় নেই, ট্রেন ধরতে হবে।

৫। মাসিকপত্র নেবেন বাবু ? ভালে-ভালো নভেল ? গ
বই।

[হুশ্‌হুশ ক'রে পাশের প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন ঢুকলো]

১। চাই পান, পান বিড়ি সিগ্রেট, পান বিড়ি—

৮। দে বাবা, এক পয়সার পান দে। বার-বার পান নিয়ে যাচ্ছিস
জানি তোদের পান অখাদ্য, তবু নিতে হ'লো।

৯। এই কুলি—এই গাড়ি খালি আছে, ইসমে তোলো, জলদি।

৮। এই গাড়ি খালি দেখলেন, মশাই ? দাঁড়াবার জায়গা নেই।

৯। দাঁড়াবার জায়গা না পাই ব'সেই যাবো। যেতে তো হবে।

[ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজলো]

৩। আর পাঁচ মিনিট।

৪। নে, উঠে পড়।

৩। ঐ যে মেয়েটি এদিকে আসছে দেখতে পাচ্ছিস ?

৪। মেয়েটি কী রে ? মহিলা বল। মাথায় সিঁদুর দেখছিস না

৬। বেশ দেখতে—না ?

৪। বেশ। সঙ্গের ভদ্রলোকটিও বেশ।

৩। মন-খারাপ করিসনে। ধৈর্য ধ'রে থাক, তোরও দিন আসবে।

পুরুষের গলা। এই যে, এই গাড়ি মনে হচ্ছে।

মেয়ের গলা। হ্যাঁ, এইটেই। এই তো লেখা আছে—Mr. & Mrs. S. K. Bagchi.

পুরুষের গলা। উঠে পড়ো।

মেয়ের গলা। মালগুলো সব উঠলো তো ?

পুরুষের গলা। হ্যাঁ, সব উঠেছে।

কুলির গলা। বকশিষ দিজিয়ে সাব।

পুরুষের গলা। নাও, এই নাও।

মেয়ের গলা। আস্ত একটা টাকাই দিয়ে দিলে।

পুরুষের গলা। রাজত্ব থাকলে রাজত্বই দিয়ে দিতুম।

মেয়ের গলা। ঐ কুলিকে ?

পুরুষের গলা। যে এসে চাইতো তাকেই। সক্কলকে।

মেয়ের গলা। তাহ'লে তো সমস্ত সৌর-জগতেও তোমার কুলোতো না।

পুরুষের গলা। তবু আমার যা বাকি থাকতো সমস্ত সৌর-জগতের চেয়ে তা বেশি।

মেয়ের গলা। সে জিনিসটা কী ?

পুরুষের গলা। একজন মানুষ। নাম তার মাধুরী। যেমন তার দেহ সুন্দর, তেমন তার হৃদয় মধুর।

মেয়ের গলা। ওগো মশাই, থামো, থামো, এত ভালোবাসা ভালো না।

খাতার শেষ পাতা

[ঢং ঢং ঘণ্টা বাজলো]

৪। উঠে পড়, গাড়ি যে ছেড়ে দিলে।

৩। ফিরে এসে তোর সঙ্গে দেখা করবো।

৪। (চেঁচিয়ে) কবে ফিরবি ?

৩। (চেঁচিয়ে) সামনের সোমবার।

২

মাধুরী। তা হ'লে সত্যি সত্যি চল্‌লাম।

শ্যামল। কেন, তুমি কি ভেবেছিলে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে না?

মাধুরী। না, তা ভাবিনি। তবে কিনা—

শ্যামল। তবে কিনা?

মাধুরী। পালাবার জন্য প্রাণ আইঢাই করছিলো—এই আরকি।

শ্যামল। তা যার কাছ থেকে পালাবার জন্য তোমার প্রাণ ছটফট করে, সে তো সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছে।

মাধুরী। খুব কথা বলতে শিখেছো তো। ট্রেনে উঠেই মুখ খুলে গেছে! এ-ক'দিন যে একেবারে মুখ-চোরা ভালোমানুষ সেজে ছিলে!

শ্যামল। এ-ক'দিনের কথা আর বোলো না! উঃ, আমাদের এই হিন্দু বিয়ে! অত্যাচার, স্রেফ অত্যাচার! সকলেরই ফুর্তি, শুধু—যে-দু'জন মানুষকে উপলক্ষ্য ক'রে এত হৈ-চৈ হুলুস্থুল, তাদের দফা রফা।

মাধুরী। তাদের জন্য তো সারা জীবনই প'ড়ে রয়েছে। ক'দিন না-হয় পাঁচজনে একটু আমোদ করলোই।

শ্যামল। ইশ, ট্রেনে উঠেই খুব ভালোমানুষ হ'য়ে গেছো দেখছি।

মাধুরী। মানুষটা আমি মন্দ কবে! কী রকম শান্ত বাধ্য ধীর স্থির—তোমার মা-কে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো।

শ্যামল। উঃ, কী কপট! কী ভণ্ড! এদিকে বলা হচ্ছে, পালাবার জন্য প্রাণ আইঢাই করছিলো।

মাধুরী। বিয়ে হ'লে মেয়েদের কি আর মনের ভাব প্রকাশ কর আছে! কপটতাই তাদের সার্থকতার সোপান।

শ্যামল। তাই নাকি?

মাধুরী। এই ধরো—তোমাদের বাড়িতে এ-ক'দিন এত লোকজ হৈ-চৈ, এত রকমের অনুষ্ঠান—এ সব কি ভালো লাগে? একটা মুহূ নিরিবিলি নেই—

শ্যামল। আমার তো বিশ্রী লাগতো—

মাধুরী। তুমি প্যানপ্যান করতেও কম করোনি। তাতে কী লা হ'লো, বলো? কিছু না। আর আমাকে ছাখো তো—এমন হাসিমু সব করেছি, সকলের সঙ্গে মিশেছি, সকলের আদেশ পালন করেছি। তোমার মা বিয়ের দু'দিন পরেই বলেছেন যে বৌ ভারি লক্ষ্মী। ত ব'লে মনে-মনে কি আর খারাপ লাগেনি? খুব লেগেছে। কিন্তু রকম না-করলে মেয়েদের চলে না।

শ্যামল। ভাগ্যিশ মেয়ে হ'য়ে জন্মাইনি—ম'রে গেলেও এত ভণ্ডা করতে পারতুম না।

মাধুরী। আমরা মেয়েরা যদি ভণ্ড না হতুম, তাহ'লে তোমা জীবনও অসহ্য হতো, সে-কথা মনে রেখো।

শ্যামল। তাহ'লে তুমি বলতে চাও, তুমি আমার সঙ্গেও কপট করো।

মাধুরী। দরকার হ'লে করি বইকি। যেমন ধরো, আমি দেখলু তোমার মুসৌরি যাবার খুব ইচ্ছে, তখন এমন ভাব দেখালুম যেন আ মুসৌরির জন্যেই ব্যাকুল।

শ্যামল। সত্যি কি তোমার মুসৌরি যাবার ইচ্ছে ছিলো না?

মাধুরী। টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে ব'সে এ-কথা জিগেস করার মানে হয় না।

শ্যামল। মুসৌরি আমার খুব ভালো লাগে। তোমারও লাগবে, দেখো।

মাধুরী। তুমি যখন বলছো, নিশ্চয়ই লাগবে।

শ্যামল। কথাটা এমন ভাবে বললে যেন আমাকে খুশি করবার জন্যই মুসৌরি গিয়ে তুমি খুশি হবে।

মাধুরী। তা-ই যদি হয়, তাতেই বা দোষ কী?

শ্যামল। তোমার মনের কথাটা কী বলো তো?

মাধুরী। মনের কথা সবই কি একসঙ্গে বলা যায়? ক্রমশ প্রকাশ্য।

শ্যামল। না, না, ঠাট্টা না—বলো না মুসৌরি যেতে তোমার অনিচ্ছা কেন? তার কি বিশেষ-কোনো কারণ আছে?

মাধুরী। মুসৌরি একবার গিয়েছি কিনা—তাই এবার ভাবছিলাম, অন্য-কোনো পাহাড়ে গেলে হ'তো।

শ্যামল। মুসৌরি তুমি আগে গিয়েছো? সে-কথা তো বলোনি।

মাধুরী। এ-রকম অনেক কথাই এখনো তোমাকে বলা হয়নি। বলবার সময় হয়নি, মাত্র বারোদিনই তো আমাদের বিয়ে হয়েছে। যদি চাও তো কোন-কোন জায়গায় আমি গিয়েছি, তার একটা লিষ্টি তোমাকে ক'রে দিতে পারি।

শ্যামল। তুমি কথায়-কথায় আমাকে অমন ঠাট্টা করো কেন বলো তো?

মাধুরী। তোমাকে ঠাট্টা করবো না তো কাকে করবো? তোমা
ঠাট্টা করবো, তোমাকে বকবো, তোমাকে ভালোবাসবো, তোমাকে পূ
করবো—

শ্যামল। ছি-ছি, কী যে বলো।

মাধুরী। কোনটা পছন্দ হ'লো না—পূজোটা? ওটা ওল্ড ফ্যা
বুঝি? এদিকে মনে-মনে কি আর লোভও না আছে। ভয় নেই,
লুকিয়ে-লুকিয়ে পূজো করবো—কেউ টের পাবে না।

শ্যামল। তুমি স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে না কেন যে মুসৌরি যেতে তু
চাও না—না-হয় উটকামণ্ড যেতুম। এখন রাগ করো কেন?

মাধুরী। আমি রাগ করেছি, এ-কথা কে বললে তোমাকে?

শ্যামল। তোমার কথার ভাবে মনে হচ্ছে।

মাধুরী। না গো না, আমি রাগ করিনি। তোমার উপর কি আ
সত্যি-সত্যি রাগ করতে পারি!

শ্যামল। আগে না-হয় মুসৌরি গিয়েইছো—আমার সঙ্গে তো আ
যাওনি। আমার সঙ্গে গেলে আবার নতুন ক'রে সব ভা
লাগবে।

মাধুরী। তুমি লোকটা তো ভারি দাম্ভিক দেখছি। তোমার সঙ্গে
কি এতই মূল্য?

শ্যামল। নিজের মন দিয়েই বিচার করছি কিনা, তাই ও-রকম ম
হচ্ছে। সেবার আমার মুসৌরি গিয়ে বড়ো ভালো লেগেছিলো, তাই তোমা
সঙ্গে যেদিন বিয়ে ঠিক হ'লো, সেদিন থেকেই ভাবছি, বিয়ের হাঙ্গাম
চুকে গেলেই তোমাকে নিয়ে মুসৌরি যাবো। নিজে যা উপভোগ ক'

এসেছি, তোমার সঙ্গে আবার তা উপভোগ্ করবো এ-কথা ভাবতেই যে কী আনন্দ, তুমি বোধ হয় তা বুঝবে না।

মাধুরী। যখন বিয়ে ঠিক হ'লো, তখন তো তুমি আমাকে চিনতেও না—ছাখোওনি কখনো। তখন থেকেই আমার কথা ভাবছো?

শ্যামল (গুনগুন ক'রে)। 'যৌবন-সরসী-নীরে মিলন-শতদল।
কোন চঞ্চল বন্যায় টলোমলো টলোমলো।'

মাধুরী। আমার কথার জবাব দিলে না?

শ্যামল। কী কথা?

মাধুরী। তখন থেকেই ভাবছো আমার কথা?

শ্যামল। তুমি ভাবতে না? কখনো মনে-মনে কল্পনা করোনি তোমার স্বামী কেমন হবে?

মাধুরী। তা আবার করিনি! বিষম দুর্ভাবনা ছিলো আমার—বুঝি সে কালো হবে, আর ইয়া বড়ো-বড়ো গোঁফ থাকবে, আর সেই গোঁফ শাদা ক'রে মস্ত বড়ো বাটিতে চুমুক দিয়ে দুধ খাবে! বিয়ের রাতে তাকিয়ে দেখি—ওমা! এ যে দিব্যি সুপুরুষ!

শ্যামল। কেন—তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো যে তোমার মতো এমন সুন্দরী—তাকে কি তোমার বাবা একটা গুঁফো হনুমানের হাতে দেবেন!

মাধুরী। না গো না, মশাই, মোটেও তা নয়। আমার বাবার জেদ ছিলো মস্ত ধনী ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেবেন না। কিন্তু ধনী কারা হয় বলো তো? হয় দালাল নয় কনট্র্যাক্টর, নয় তো তেলের কি তিসির ব্যবসাদার। আর এদের চেহারা কেমন হয় তা তো জানো! বাবাঃ—

ভয়ে আমার বুক কাঁপতো সব সময়—কপালে কী না জানি লে[illegible]
আছে।

শ্যামল। আমার বাবারও পণ ছিলো যে ধনীকন্যা ছাড়া ছেলের বি[illegible]
দেবেন না।

মাধুরী। তা তোমার ভয় করতো না? কাণা কি হাবা, খোঁড়া [illegible]
বোবা একটা মেয়ের সঙ্গে যদি—

শ্যামল। না, আমার সে-রকম কোনো ভয় হতো না; বড়ে[illegible]
লোকের মেয়েরা সুন্দরী হয় এ তো জানা কথাই।

মাধুরী। তাই নাকি? তোমরা ক'-পুরুষের বড়লোক?

শ্যামল। ধনঞ্জয় শর্মা আমাদের বংশের আদি পুরুষ। [illegible]
কোম্পানির আমলে এক বিলেতি ফর্মের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তারপর [illegible]
পুত্র (আমার প্রপিতামহ) শিবেশ্বর বাগচি পাবনা-রাজসাহী অ[illegible]
বিস্তর ভূসম্পত্তি করেন—

মাধুরী। আর তার পর থেকেই তোমরা জমিদার হ'য়ে বস[illegible]
হ্যাঁ, পাকা বনেদি ঘর—তোমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। একে[illegible]
ননীর পুতুল। কখনো গায়ে রোদের আঁচটি লাগেনি। জানো, তো[illegible]
ছুঁতে আমার ভয় করে—মনে হয় সাজানো পুতুলটি হঠাৎ বুঝি [illegible]
প'ড়ে যাবে।

শ্যামল। আবার ঠাট্টা!

মাধুরী। না, না, সত্যি—কী সুন্দর গো তুমি—আমার চো[illegible]
পলক পড়ে না। আচ্ছা, তোমাদের বংশের আদিপুরুষ তো
শর্মা—তার আগে?

শ্যামল। তার আগে আর জানিনে।

মাধুরী। আহা—তার আগে ছিলো তো কেউ?

শ্যামল। ছিলো নিশ্চয়ই। তবে মানুষের বংশাবলী তো আর অ্যাডাম-ঈভ থেকে তৈরি হয় না।

মাধুরী। ভাগ্যিশ হয় না। তাহ'লে ধরা পড়তো যে সবারই পূর্ব-পুরুষ এক। তাহ'লে কী উপায় হ'তো!

শ্যামল। সে-কথাই যদি বলো তাহ'লে আরো দূরে চ'লে যাও না কেন? ব্যাং, মাকড়সা, ইঁদুর, মানুষ—সবই তো এক।

মাধুরী। সে তো সত্যি। আচ্ছা, তোমাদের আয় কত?

শ্যামল। খুব বেশি না—বছরে লাখ দুই।

মাধুরী। কী সর্বনাশ! দুই লাখ! আর আমার বাবা বছরে টেনে-টুনে পঞ্চাশ হাজার রোজগার করেন! তাও এখন প্র্যাকটিসের অবস্থা খুব ভালো যাচ্ছে—এ-রকম আগেও ছিলো না, কিছুদিন পরেও হয়তো আর থাকবে না। জানো, আমার ছেলেবেলায় আমাদের গাড়ি পর্যন্ত ছিলো না, বাবা, ট্রামে চ'ড়ে কোর্টে যেতেন। কয়েকটা স্বদেশি মামলা ক'রে হঠাৎ তাঁর প্র্যাকটিস ফেঁপে উঠলো।

শ্যামল। তোমার বাবা বলছেন আমাকে তাঁর জুনিয়র ক'রে নেবেন।

মাধুরী। সে কী! তুমিও উকিল হবে নাকি? ঐরকম মোটা-মোটা বইয়ে নাক ডুবিয়ে ব'সে থাকবে! তাহ'লেই গেছি আরকি।

শ্যামল। তা কিছু কাজকর্ম করতে হবে তো।

মাধুরী। ষাট, ষাট, তোমাকে কেন কাজকর্ম করতে হবে! পূর্ব-পুরুষের পুণ্যফলে বড়োলোকের ছেলে হ'য়ে জন্মেছো—পায়ের উপর পা

তুলে ব'সে খাবে আর সুন্দরী তরুণী ভার্যার সঙ্গে প্রেম করবে—অবশ্য যতদিন ভালো লাগে।

শ্যামল। তোমার আজ হয়েছে কী, বলো তো? খোঁচা না-দিয়ে যে কথাই বলতে পারো না! তুমি কি বোঝো না যে ও-সব কথা শুনলে আমার মনে কষ্ট হয়?

মাধুরী। কোন কথাটা শুনে কষ্ট হ'লো? বলো না গো—কোনটা।

শ্যামল। (চুপ)।

মাধুরী। ও, বুঝেছি। ঐ—'যতদিন ভালো লাগে'—ঐ কথাটা তোমার খারাপ লেগেছে, না?

শ্যামল। তবে তো বোঝোই। মনে হচ্ছে বড়োলোকের ছেলে সম্বন্ধে তোমার বেন বিশেষ ভালো ধারণা নেই।

মাধুরী। কী ক'রে থাকবে, বলো? আমিও তো বড়োলোকের মেয়ে—অবশ্য তোমাদের তুলনায় কিছু নয়, তবু উঁচু কেলাশের লোক তো বটে। আর আশে-পাশে যা সব দেখে আসছি! কতগুলো টেরি-কাটা রং-মাখা সং—একটারও যদি মনুষ্যত্ব ব'লে কিছু থাকে!

শ্যামল। তা'হলে এই হতভাগ্যকে—যে পূর্বজন্মের অজ্ঞাত কোনো পাপের ফলে ধনীপুত্র হ'য়ে জন্মেছে, তাকে পছন্দ করলে যে বড়ো?

মাধুরী। সর্বনাশ—কী যে বলো! গরীবের সঙ্গে কি আমার বিয়ে হ'তে পারে—পাগল! আমি—বিখ্যাত অ্যাডভোকেট ডি. কে. হালদারের পরমাসুন্দরী লোরেটোয় পড়া কন্যা! সুখে, আরামে, বিলাসিতায় থাকতে না-পারলে কি আমার চলে!

শ্যামল। তাহ'লে তুমি বলছো আমার পয়সাকেই তুমি বরণ করেছো —আমাকে নয়?

মাধুরী। ও দুটোকে আলাদা ক'রে দেখা কি সম্ভব? তুমিই কি তা পারো? তুমি কি কল্পনা করতে পারো যে পয়লা নম্বরি এম. এ. ডিগ্রি নিয়ে তুমি চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছো, আর সেই অবস্থায় ডি. কে. হালদারের কন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লো? পারো কল্পনা করতে?

শ্যামল। কেন পারবো না? এ-রকম কি হয় না কখনো?

মাধুরী। হয় কিনা জানি না, কিন্তু আমার বেলায় হ'তো না।

শ্যামল। তুমি যদি চাইতে, তবু হ'তো না?

মাধুরী। আমার চাওয়া না-চাওয়ার কী মূল্য? বাবার ইচ্ছাই সব। তুমি কি ভাবো যে আমি স্বয়ম্বরা হ'লেও তোমাকেই বিয়ে করতুম?

শ্যামল। করতে না?

মাধুরী। কে জানে, হয়তো করতুম না।

শ্যামল। কাকে করতে?

মাধুরী। তা কি আমি জানি? তাকে কি আমি দেখেছি কখনো?

শ্যামল। কখনো ছাখোনি? কখনো এমন-কোনো পুরুষ ছাখোনি যে রং-মাখা সং নয়—যে সত্যিকার মানুষ?

মাধুরী। একবার দেখেছিলাম একজনকে।

শ্যামল। দেখেছিলে?

মাধুরী। তার মনুষ্যত্ব ছিলো—কিন্তু ছুরি-কাঁটা দিয়ে খেতে শেখেনি। মা তাকে ডিনারে নেমন্তন্ন ক'রে বিপদেই পড়লেন।

শ্যামল। সে কে?

মাধুরী। (গান গেয়ে) তা বলবো না, তা বলবো না, তা বলবো না। (খিলখিল ক'রে হেসে উঠে) তোমাকে খ্যাপাতে ভারি মজা, এত সহজে গম্ভীর হয়ে যাও। শোনো—মনুষ্যত্বওলা পুরুষ সত্যি বলতে একজনই দেখেছি, তিনি এখন আমার পাশে ব'সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন—এমন-যে পদ্মের মতো একখানি মুখ তাঁর চোখের সামনেই ফুটে রয়েছে, সে-বিষয়ে আপাতত তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন।

শ্যামল। মাধুরী, তোমাকে একটা কথা বলি। বড়োলোকের ছেলে সাধারণত যে-রকম হয় সত্যি আমি সে-রকম নই। ছেলেবেলা থেকেই এই অলস, বিলাসী জীবন আমার খারাপ লেগেছে। সুবিধে পেলেই আমাদের এই তিনপুরুষের প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে আমি আলাদা থাকবো—বড়ো হবার পর থেকেই এই সঙ্কল্প আমার মনে বাসা বেঁধেছে। প্রাসাদ!—ওটা একটা জেলখানা। ওখানে হাসতে হয় নিয়মে, বসতে হয় নিয়মে, ফুর্তি করতে হয় নিয়মে, উচ্ছন্নে যেতে হয়—তাও বাঁধা নিয়মে। সত্যি বলছি তোমাকে, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। নিজে অর্থোপার্জন করবো, মনের মতো একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে আলাদা বাড়িতে স্বাধীনভাবে থাকবো—এই আমার উচ্চাশার চরম। তাই ভাবছি, ফিরে এসেই খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিসে লেগে যাবো, তোমার বাবার ব্যাকিং পেলে একেবারে যে কিছু করতে না পারবো তা নয়।

মাধুরী। ও, তাই বলো! তুমি তাহ'লে বাবার ব্যাকিংকে বিয়ে করেছো, আমাকে নয়!

শ্যামল। তোমাকে বিয়ে না-করলেও তোমার বাবার ব্যাকিং আমি পেতুম।

মাধুরী। তা হয়তো পেতে। তবে বিয়ে ক'রে আরো একটু স্থবিধে হ'লো, এই যা।

শ্যামল। তোমাকে বিয়ে ক'রে কোনো বিষয়ে আমার যদি কোনো স্থবিধে হয় সে তো আমার দোষ নয়।

মাধুরী। না, না, আমি তা বলছি না। স্থবিধে হবে ব'লেই তো আমাকে বিয়ে করোনি!

শ্যামল। পাগল! এ-কথা তুমি কেমন ক'রে ভাবতে পারলে!

মাধুরী। সত্যিই তবে আমিই তোমার মনের মতো মেয়ে?

শ্যামল। তুমি আমার সমস্ত কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছো, মাধুরী।

মাধুরী। তুমি আমাকে ভালোবাসো?

শ্যামল। বোকা—বোঝো না!

মাধুরী। না—বলো! আমাকে খুব ভালোবাসো? সত্যি—বলো না গো।

শ্যামল। এ-সব কথা কেউ বুঝি কখনো বলে!

মাধুরী। না, না, বলো। বলো।

শ্যামল। তোমাকে ভালোবাসি।

মাধুরী। না, হ'লো না—বলো, খুব ভালোবাসি।

শ্যামল। তোমাকে খুব ভালোবাসি।

মাধুরী। চিরকাল ভালোবাসবে?

শ্যামল। চিরকাল ভালোবাসবো।

মাধুরী। যাক—একটা ভাবনা ঘুচলো। বড়ো ভয় ছিলো—দু'দিন পরে হয়তো তোমার তাপ জুড়িয়ে যাবে।

শ্যামল। এ-সব ছাইভস্ম কথা বোলো না, মাধুরী।

মাধুরী। না, আর বলবো না। তুমি আমাকে ভালোবাসো, খুব ভালোবাসো, চিরকাল ভালোবাসবে—আর কী চাই।...আচ্ছা, তুমি আর কাউকে কখনো ভালোবেসেছো?

শ্যামল। ছাখো, সত্যি আমি এবার রাগ করবো। কী যে বলো তার মাথামুণ্ডু নেই।

মাধুরী। কেন বলো না! শুনে আমি একটুও রাগ করবো না, দুঃখিতও হবো না—এই তোমাকে কথা দিচ্ছি। কখনো কোনো মেয়ে তোমার চোখে পড়েনি যাকে দেখে তোমার মনে হয়েছে এই তোমার মনের মতো মেয়ে?

শ্যামল। ষোলো থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত যে-কোনো মেয়েকে চোখে দেখেছি তাকেই মনে হয়েছে আমার মানসী।

মাধুরী। তার পরে?

শ্যামল। তার পরে তুমি।

মাধুরী। মাঝে আর কিচ্ছু নেই?

[হঠাৎ খুব জোরে ট্রেনের হুইসল বেজে উঠলো]

মাধুরী। বাব্বাঃ—চমকে উঠেছিলাম। কোনো ষ্টেশন এলো নাকি?

শ্যামল। না, না, বর্ধমানের আগে আর দাঁড়াবে না। বিছানাটা পেতে দেবো—শোবে?

মাধুরী। না, এক্ষুনি শোবো কী—আটটাও তো বাজেনি। বর্ধমান কখন আসবে?

শ্যামল। দেরি আছে—একটু শুয়ে নাও না।

মাধুরী। না, শুতে ইচ্ছে করছে না। এই বেশ। বর্ধমানে আবার তো রেস্তোরাঁ-কারে যেতে হবে?

শ্যামল। যদি বলো খাবারটা এখানেও আনিয়ে নিতে পারি—

মাধুরী। না, ওখানে গিয়েই খাবো। রেস্তোরাঁ-কারে ব'সে খেতে আমার খুব ভালো লাগে। বড়ো আলোটা নিবিয়ে দাও না, বড্ড চোখে লাগছে।

শ্যামল (আলো নিবিয়ে)। ঠিক আছে?

মাধুরী। বাঃ, বেশ হয়েছে। এ-রকম চাপা আলো আমার ভারি ভালো লাগে। ···ত্যাখো, আমরা তো সেকেণ্ড ক্লাশে এলেও পারতুম, অনেকগুলো টাকা বাঁচতো। সেকেণ্ড ক্লাশ কূপে তো মন্দ নয়।

শ্যামল। আমি সাধারণত সেকেণ্ড ক্লাশেই চলি। এবার তুমি সঙ্গে আছো ব'লেই ফার্স্ট ক্লাশ।

মাধুরী। ও, আমার উপলক্ষ্যে তোমারও পদোন্নতি হ'লো বুঝি?

শ্যামল। তা আর বলতে! রীতিমতো রাজা হ'য়ে গিয়েছি।

মাধুরী। আমার সে-কথার কিন্তু এখনো জবাব দাওনি।

শ্যামল। কোন কথার?

মাধুরী। রীতিমতো রাজা হবার আগে রাজা হবার কাছাকাছি কখনো এসেছিলে কিনা?

[গাড়ির গতি একটু ক'মে এলো। লাইন-বদলের শব্দ]

শ্যামল। গাড়ির স্পীড কমছে ব'লে মনে হচ্ছে।

মাধুরী। তাই তো—খুবই তো ক'মে এলো।

শ্যামল। বোধ হয় কোনো ষ্টেশনের লাইন-ক্লিয়র নেই—ত
দাঁড়াবে।

মাধুরী। না, না, ঐ ছাখো—একটা ষ্টেশন।

শ্যামল। তাই তো, ছোট্ট একটা ষ্টেশন যে। এখানে গাড়ি দাঁড়
কেন?

মাধুরী। ঐ ছাখো, আলোর গায়ে নাম লেখা রয়েছে—বেলমুড়ি
বেলমুড়ি কী মজার নাম! লেপমুড়ি হ'লে আরো মজা হ'তো।

শ্যামল। এখানে ট্রেণ আবার দাঁড়ালো কেন? টাইম-টেবিলে (
বর্ধমানের আগে ষ্টপ নেই। রেল-কোম্পানিগুলো দিন-দিন হচ্ছে কী
দেখছো তো, কেউ উঠছে না, কেউ নামছে না, খামকা সময় নষ্ট।

মাধুরী। ঐ ছাখো দু'জন লোক এদিকে আসছে। তারা বোধ
এ-ট্রেণে যাবে।

শ্যামল। বেলমুড়ি থেকে ডুন এক্সপ্রেস ওঠবার কোনো রাইট (
তাদের। এ কি কামারকুণ্ডু লোকাল নাকি

মাধুরী। রাইট না-থাকলেও তারা রাইট ক'রে নিয়েছে ব'লে ম
হচ্ছে। তার উপর আবার ভাবটা যেন আমাদের কামরাতেই উঠবে।

শ্যামল। অসম্ভব। আমাদের কামরা রিজার্ভ করা—কারো স
নেই ওঠে।

মাধুরী। ঐ ছাখো—

শ্যামল। What do you mean, sir? This is a—

[ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজলো]

শ্যামল। এ কী! বিছানা! বাক্স! But you can't get in here. This is a—

মাধুরী। গাড়ি যে ছেড়ে দিলে—উঠে পড়ুন আপনারা, চট ক'রে উঠে পড়ুন।

আগন্তুক পুরুষের গলা। Thank you very much.

আগন্তুক মেয়ের গলা। একটু বসতে পারি?

মাধুরী। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বসুন। ঢের জায়গা আছে। [গার্ডের হুইসল শোনা গেলো]

[গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো]

শ্যামল। But I'll complain! I'll complain! you can't get into a reserved compartment. This is trespass.

আগন্তুক পুরুষ। Do complain by all means.

শ্যামল। মশাই, আপনি কী ব'লে এ-কামরায় উঠলেন? আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? জানেন, আমি এক্ষুনি চে· টেনে—

মাধুরী। আহা—চুপ করো তুমি। কী হয়েছে তাতে? খানিক পরেই তো বর্ধমান—সেখানে ওঁরা নিজেদের কামরা খুঁজে নেবেন।

শ্যামল। আপনাদের কোন ক্লাশের টিকিট জানতে পারি?

আগন্তুক পুরুষ। এটা কোন ক্লাশের গাড়ি?

শ্যামল। ফার্ষ্টক্লাশ।

আগন্তুক পুরুষ। তা'হলে ঠিকই আছে। অন্ধকারে নিজেদে কামরাটা ঠিক করতে পারিনি—তাছাড়া গাড়ি তো আধ মিনিটের বে দাঁড়াবে না—

শ্যামল। এখানে গাড়ি তো আধ সেকেণ্ডও দাঁড়াবার কথ নয়।

আগন্তুক পুরুষ। ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জর থাকলে দয়া ক'রে আ মিনিট দাঁড়ায়।

শ্যামল। তাহ'লে আপনাদের জন্যই দাঁড়িয়েছিলো, বলুন।

আগন্তুক পুরুষ। তা বলতে পারেন। আপনাদের বিরক্ত করতে হ'লো, কিছু মনে করবেন না। বর্ধমান এলেই—

মাধুরী। থাক, থাক, আপনাকে আর বলতে হবে না। তাতে হয়েছে কী—আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ...বড়ো আলোটা জ্বালিয়ে দাও তো, বড়ো অন্ধকার লাগছে।

শ্যামল (আলো জ্বালিয়ে)। এ কী? রঞ্জন!

আগন্তুক মেয়ে। মাধুরী!

আগন্তুক পুরুষ। শ্যামল!

মাধুরী। অঞ্জলি!

শ্যামল। এ কী কাণ্ড? তোমরা কোত্থেকে? কতদিন পর দেখা বলো তো! অত্যন্ত দুঃখিত—তোমাকে চিনতে পারিনি। যা তা বলেছি, কিছু মনে কোরো না।

অঞ্জলি। কী ভাগ্যি এ-গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম—তাই তো তোর সঙ্গে দেখা হ'লো মাধুরী।

রঞ্জন। এতে আর মনে করার কী আছে। চিনতে পারলে তো আর বলতে না। আমিও তোমাকে চিনতে পারিনি—আশ্চর্য!

মাধুরী। তোকে কিন্তু আমার প্রথম থেকেই চেনা-চেনা লাগছিলো। কিন্তু ঠিক ঠাউরে উঠতে পারিনি!

অঞ্জলি। আমারও তা-ই দশা। গাড়িতে যা কম আলো ক'রে রেখেছিলি!

মাধুরী। ইস্কুল ছাড়বার পর এই তোর সঙ্গে প্রথম দেখা—না? সেই বেলতলায়—মনে আছে?

অঞ্জলি। মনে নেই আবার! তার পরেই তো তুই বড়োলোক হ'য়ে লোরেটোয় চ'লে গেলি।

শ্যামল। তোমাকে দেখেই আমার চিনতে পারা উচিৎ ছিলো, কিন্তু এই ঝিঁ ঝিঁ-ডাকা বেলমুড়ি ষ্টেশন থেকে তুমি উঠবে তা কি স্বপ্নেও ভাবা যায়! আর তাই—আচ্ছা এখান থেকে উঠলেই বা কেন?

রঞ্জন। এখানে একটু এসেছিলুম—এটা আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ—ও, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি বুঝি? অঞ্জলি—আমার কলেজের বন্ধু শ্যামলকুমার বাগচি—হঠাৎ অমন থমকে গেলে কেন শ্যামল?

শ্যামল। কিছু না। তুমি বিয়ে করলে কবে?

রঞ্জন। আর বোলো না ভাই, হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। তোমাকে দেখেও তো নব-বিবাহিত মনে হচ্ছে।

শ্যামল। হ্যাঁ, এই তো ক'দিন মাত্র বিয়ে হয়েছে। তোমরা এখন চলেছো—

রঞ্জন। মুসৌরি।

শ্যামল। আমরাও যে মুসৌরি যাচ্ছি।

রঞ্জন। এই যোগাযোগে তুমি যে খুব খুশি হয়েছো তা তো মনে হচ্ছে না। হঠাৎ হ'লো কী তোমার? তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়েও দিলে না।

শ্যামল। মাধুরি—ইনি আমার কলেজের বন্ধু রঞ্জন সরকার—হঠাৎ তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন, মাধুরি? শরীর খারাপ হ'লো না তো?

মাধুরী। না, না,…ও কিছু না।

[প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ। শুধু ট্রেণ চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে]

অঞ্জলি। কেউ কিছু একটা বলুক।

রঞ্জন। আমিও ভাবছিলুম সবাই হঠাৎ চুপ হ'য়ে গেলো কেন।

শ্যামল (ফুর্তির ভাব আনবার চেষ্টা ক'রে)। I say, Ranjan, I am really so happy to meet you—

রঞ্জন। তোমার হাবে-ভাবে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না—

মাধুরী (ক্ষীণস্বরে)। বর্ধমান কখন পৌঁছবে?

রঞ্জন। মিসেস বাগচি, আমাদের সঙ্গে দু'মিনিটেই আপনাকে ক্লান্ত ক'রে তুলেছে, দেখছি।

অঞ্জলি। আমাদের উপর ওঁদের যখন এতই অরুচি তখন মুসৌরি গিয়ে তো আরো মুশকিল হবে। ছোটো জায়গা, পথে-ঘাটে বার-বার দেখা হবেই।

মাধুরী। সেজন্যে তুই ভাবিসনে, অঞ্জলি, মুসৌরি আমরা যাবো না।

রঞ্জন। সে কী কথা!

শ্যামল। মুসৌরি যাবে না!

মাধুরী। না, আমরা লক্ষ্ণৌয়ে নেমে থাকবো—সেখানে আমার মামা আছেন।

অঞ্জলি। না, না, তা কি হয়! বরং আমরাই—

রঞ্জন। অঞ্জলি, মুসৌরি তোমারও চক্ষুশূল হ'য়ে উঠলো নাকি?

অঞ্জলি। আমি তো বরাবরই মুসৌরির বিরোধী ছিলুম। চলো আমরা নৈনিতাল যাই। এই ঠিক হ'লো।

মাধুরী। না, না, সে হ'তে পারে না। তোরা যেখানে যাচ্ছিস যা—আমরা লক্ষ্ণৌ নেমে থাকবো।

অঞ্জলি। ককখনো না। আমরা নৈনিতাল যাবো, এই স্থির—তোরা যাবি মুসৌরি।

মাধুরী। সে হ'তেই পারে না। আমরা লক্ষ্ণৌতেই নেমে থাকবো—

অঞ্জলি। আমরা যাবো নৈনিতাল—

মাধুরী। আমরা লক্ষ্ণৌ—

অঞ্জলি। আমরা নৈনিতাল—

রঞ্জন। আহা—এ নিয়ে এত বিতণ্ডা করছো কেন তোমরা। আমরা যাবো নৈনিতাল, এঁরা যাবেন লক্ষ্ণৌ—তাহ'লেই তো হ'লো। কারো সঙ্গে কারো দেখা না-হ'লেই হ'লো তো! কিন্তু কেন যে আমাদের পরস্পরের মুখ-দেখা বন্ধ করতে হবে, তার কারণ—

মাধুরী। তার কারণ জানতে চান?

রঞ্জন। জানতে চাইবো না? আপনি আর অঞ্জলি বাল্যবন্ধু, আমার সঙ্গেও শ্যামলের অনেক দিনের বন্ধুতা, অথচ কেন যে—

মাধুরী। কেন শুনবেন?

রঞ্জন। বলুন।

মাধুরী। আমাকে আপনি চিনতে পারচেন?

রঞ্জন। আপনি শ্যামলের স্ত্রী—

মাধুরী। না,—ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা। আগে কখনো দেখেছেন? কী, চুপ ক'রে আছেন যে?

শ্যামল (হঠাৎ জোর গলায়)। রঞ্জন, তুমি যদি ভদ্রসন্তান হও তাহ'লে এ প্রশ্নের স্পষ্ট ও সত্য জবাব দেবে।

রঞ্জন (ক্ষীণস্বরে)। হ্যাঁ, দেখেছি।

মাধুরী। কোথায়?

রঞ্জন। কলকাতায়···মুসৌরিতে।

শ্যামল। মুসৌরিতে! ও, তাই!

মাধুরী। আপনার মনে আছে, আমার বাবা আপনাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছিলেন?

শ্যামল। কী হে রঞ্জন, এ কী শুনছি? ভদ্রমহিলাদের পিছনে ধাওয়া করা কবে থেকে তোমার পেশা?

অঞ্জলি। শ্যামল বাবু, আপনি মনে রাখবেন, আপনি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁকে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই।

মাধুরী। কী, মনে পড়ে?

অঞ্জলি। মিথ্যে কথা! সব মিথ্যে কথা! আমার স্বামী ও-রকম হ'তেই পারেন না! মাধুরী, কোন সাহসে তুমি—

শ্যামল। আপনি কি বলতে চান, আমার স্ত্রী মিথ্যুক! আমার স্ত্রী!

অঞ্জলি। তা নয় তো কী? এত বড়ো সাহস, বলে কিনা—

শ্যামল। আপনি চুপ করুন—রঞ্জনের কী বলবার আছে, বলুক।

অঞ্জলি। না, আমি চুপ করবো না। (চেঁচিয়ে) চুপ করবো না।

শ্যামল। আপনি তো ভারি···ও, আপনিই সেই টালিগঞ্জের অঞ্জলি মিত্তির, না?

অঞ্জলি। কেন ভাণ করছেন? প্রথম দেখেই তো চিনতে পেরেছিলেন।

রঞ্জন। অঞ্জলি! শ্যামলকে তুমি আগেই চিনতে!

মাধুরী। এ কী! এঁকে তুমি চিনলে কেমন ক'রে?

শ্যামল। বছর দুই আগে ওঁর বাবা খেপে গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার জন্য।

অঞ্জলি। কী?···কী বললেন? আমার বাবা·

শ্যামল। হ্যাঁ, কী তিনি না করেছেন! বাবার কাছে এসে হাতে-পায়ে ধরতে বাকি রাখেননি।

রঞ্জন। শ্যামল, তুমি দেখছি ভদ্রমহিলার সম্মান রেখে কথা বলতে শেখোনি।

অঞ্জলি। উঃ, কী ভয়ানক মিথ্যা কথা! ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যাই।

মাধুরী। এটা ঘর নয়, অঞ্জলি, চলতি ট্রেণ। বেরিয়ে যেতে হ'লে লাফিয়ে প'ড়ে মরা ছাড়া উপায় নেই।

অঞ্জলি। সেইজন্যই তো এত অপমান সহ্য করছি। নয়তো…

শ্যামল। রঞ্জন, তোমার কী বলবার আছে, তা তো শুনলাম না।

মাধুরী। বলবেন আবার কী? কোন মুখে কথা বলবেন? জিজ্ঞেস করি, তখন তো পথে-পথে ঘুরে বেড়াতেন—হঠাৎ এত পয়সা হ'লো কেমন ক'রে যে ফার্স্ট কেলাশে চেপে হনিমুনে যাচ্ছেন?

রঞ্জন। হয়েছে পয়সা। হঠাৎ ফেঁপে উঠেছি।

মাধুরী। শ্বশুরকে শুষছেন বুঝি খুব?

রঞ্জন। শ্বশুরটি শোষণযোগ্য হ'লে আমার বন্ধু শ্যামল কি আর সুযোগ ছাড়তো!

শ্যামল। কী? কী বললে?

রঞ্জন। মস্ত চাকরি পেয়ে গেছি হঠাৎ।

শ্যামল। But you must apolegise.

রঞ্জন। রেলের চাকরি—ভারতবর্ষের আগাগোড়া ফার্স্ট কেলাশ পাশ।

শ্যামল। রঞ্জন, আমার কথায় কান দিচ্ছো না যে?

রঞ্জন। —তাই এক মাস ছুটি নিয়ে বেরিয়েছি, অঞ্জলিকে নিয়ে একটু ঘুরে আসবো।

মাধুরী। প্রথমেই যাচ্ছেন মুসৌরি?

রঞ্জন। যাচ্ছিলুম, তা দেখছেন তো…

অঞ্জলি। থাক, থাক, তোমার আর অত ভালোমানুষের মতো এঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে না। মাধুরী—তোর এখন অনুশোচনায় হৃদ্‌

চ'লে যাচ্ছে, না রে? হায়রে, তখন যদি জানতুম, এই লোকটা মস্ত চাকুরে হবে! কী আর করবি, বল! জীবনে এ-রকম ওলোট-পালট হ'য়েই থাকে।

মাধুরী। অঞ্জলি তুই বোধহয় জানিস না যে আমার স্বামীর বাৎসরিক আয় দু' লাখ টাকা।

অঞ্জলি। জানি, জানি, তোর স্বামীর কথা সবই জানি।

মাধুরী। সবই জানিস, কী রকম?

অঞ্জলি। যদি না বলি?

মাধুরী। নিশ্চয়ই বলবে। আলবৎ বলবে। বলতেই হবে তোমাকে।

শ্যামল। বলুন না, আপনার যা খুশি বলুন না। আমি কি ভয় পাই?

রঞ্জন। অঞ্জলি, তুমি আমার এই বন্ধুর সম্বন্ধে কী জানো, তা জানতে আমারও খুব কৌতূহল হচ্ছে—

অঞ্জলি। দু' বছর আগে যখন কাকার সঙ্গে মুসৌরি গিয়েছিলাম, এই লোকটি—এখন যিনি তোমার স্বামী হয়েছেন—তাঁর উৎপাতে রাস্তায় বেরোতে পারতাম না। আমার কাকা তো একদিন—

শ্যামল। উঃ, কী ভয়ানক মিথ্যা! এদিকে ওঁর বাবা গিয়ে আমার বাবাকে—

অঞ্জলি। তা তো বটেই! আমার বাবা নিজে তো বড়োলোক নন, অপদার্থ ধনী-পুত্রের উপর তাঁর কোনো মোহ নেই।

মাধুরী। মুখ সামলে কথা বোলো, অঞ্জলি। জানো, তুমি আমার বাবাকে অপমান করছো!

রঞ্জন। বুঝেছি, অঞ্জলি, এইজন্যেই মুসৌরি যেতে তোমার আপত্তি ছিলো। তুমি বুঝি ভেবেছিলে যে এবারেও শ্যামল···হুঁ, বোঝা গেলো ব্যাপারটা।

শ্যামল। কী বুঝেছো? বলো দেখি স্পষ্ট ক'রে।

রঞ্জন। যা বোঝবার তা বুঝেছি।

শ্যামল। বলোই না! মুখ ফুটে বলোই না। দেখি তোমার কত সাহস।

রঞ্জন। থাক, আমার সাহসের পরীক্ষা আর নিতে হবে না।

অঞ্জলি। উঃ, মাথাটা ধ'রে গেলো চ্যাঁচামেচিতে।

মাধুরী। কী কুক্ষণেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম!

অঞ্জলি। মাধুরী, আমার স্বামীর নামে তুমি যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছো তা যদি প্রত্যাহার না করো—

মাধুরী। কী ক'রে জানলে মিথ্যা?

অঞ্জলি। আর তোমার স্বামী আমার নামে, আমার বাবার নামে যে-কলঙ্ক রটনা করেছেন, তার জন্যে যদি ক্ষমা না চান—

মাধুরী। কী করবে তাহ'লে? মানহানির মামলা করবে? তুমিও তো বাপু আমার স্বামীর নামে কম বললে না। আসল কথা, ওঁর উপর তোমার লোভ ছিলো—উনি ফশকে গেলেন, এখন তাই জ্ব'লে পুড়ে মরছো।

অঞ্জলি। মাধুরী, মনে রেখো আমার স্বামী এখানে উপস্থিত। তিনি যদি অত্যন্ত ভালোমানুষ না-হতেন, এ-কথা শোনামাত্র তোমাকে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

শ্যামল। কী, আমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবে ঐ স্কাউণ্ড্রেল!

অঞ্জলি। স্কাউণ্ড্রেল কাকে বলছেন? নিজে যা, আর সকলকে তা-ই ভাবেন বুঝি?

শ্যামল। আপনি স্ত্রী জাতীয় জীব, তাই কিছু বলতে পারলুম না—

অঞ্জলি। কমই বা বললেন কী? স্ত্রী জাতীয় জীব—এ আবার কেমন কথা! আমি কী শেয়াল, না কুকুর?

মাধুরী। না, তুমি একটি বেড়াল। বেশ গোলগাল মোটাসোটা শাদা রঙের একটি বেড়াল তুমি।

অঞ্জলি। বটে? আর তুমি কী? একটি লিকলিকে ঘাড়-বাঁকানো সবুজ গিরগিটি।

মাধুরী। তুমি চুপ ক'রে আছো যে? আমার এ-অপমান সহ্য করছো!—

অঞ্জলি। ওগো শুনছো, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছো কী?—

মাধুরী। তুমি কি মানুষ!

অঞ্জলি। —গায়ে রক্ত নেই তোমার! মেয়েটাকে তুলে ধ'রে—

মাধুরী। —এ অপমানের প্রতিশোধ—

অঞ্জলি। —জানলা দিয়ে ছুঁড়ে—

মাধুরী। না যদি নাও—

অঞ্জলি। —বাইরে ফেলে দিতে পারো না!

মাধুরী। তবে তুমি কিসের পুরুষ!

রঞ্জন। আহা—এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন, অঞ্জলি?

মাধুরী। কী, তুমি কিছু বলছো না যে?

শ্যামল। মাধুরী, তুমি—তুমি যদি একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে—

অঞ্জলি। উত্তেজিত হচ্ছি কেন? এতেও যে উত্তেজিত হয় না, সে কি মানুষ! বুঝেছি, মাধুরী ঠিকই বলেছে, তুমি লোক ভালো নও, এখনো তুমি মাধুরীর দিক টেনেই কথা বলছো! ওঃ! আমার কপালে এই ছিলো!

রঞ্জন। অঞ্জলি, আমার কথাটা তুমি ঠিক বোঝোনি—

অঞ্জলি। চাইনে, চাইনে তোমার কোনো কথা শুনতে—

মাধুরী। অঞ্জলি, তুই-ই ঠিক বুঝেছিস। এরা পুরুষ মানুষ, এদের বিশ্বাস নেই! ইনিও কিনা আমাদের মাথা ঠাণ্ডা করবার উপদেশ দিচ্ছেন! বিয়ের পরে নিজের স্ত্রীর অপমান যে অনায়াসে সহ্য করতে পারে, বিয়ের আগে সে যে কেমন ছিলো তা তো বোঝাই যায়!

শ্যামল। মাধুরী, তুমি একটু ভেবে ত্যাখো—

মাধুরী। থাক, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। অঞ্জলি, তোর মতো আমারও ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি চলতি ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ি।

রঞ্জন। তার দরকার হবে না। বর্ধমান এসে গিয়েছে।

[ট্রেণের স্পীড ক'মে এলো]

অঞ্জলি। আমি কলকাতায় ফিরে যাবো, মা-র কাছে ফিরে যাবো, মা-র কাছে না-গেলে আমার মন আর ভালো হবে না।

রঞ্জন। বেশ, তা-ই চলো।

অঞ্জলি। কিছু ভালো লাগছে না! কিছু ভালো লাগছে না!

রঞ্জন। তুমি যা বলছো তা-ই হবে, অঞ্জলি। আমরা কলকাতাতেই ফিরে যাবো।

শ্যামল। তুমি কী করবে, মাধুরী? মুসৌরি যাবে? না, যাবে না।

মাধুরী। যা তোমার ইচ্ছে।

শ্যামল। তোমারও কি কিছুই ভালো লাগছে না?

মাধুরী (অসহিষ্ণুভাবে)। বিরক্ত কোরো না, চুপ ক'রে থাকো।

রঞ্জন। মহিলারা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন, তাঁদের এখন বিশ্রাম করাই দরকার।

শ্যামল। যাক, বাঁচা গেলো—বর্ধমান এলো।

(গাড়ি থামলো)

বাইরে কণ্ঠস্বর ১। বর্ধমা—ন। বর্ধমা—ন।

২। পান বিড়ি, পান বিড়ি সিগ্রেট, পান বিড়ি সিগ্রেট।

রঞ্জন। এই কুলি—কুলি। ...আচ্ছা, আমরা নামি তা'হলে। শ্যামল, তুমিও নামছো?

শ্যামল। হ্যাঁ, আমরা রেস্তোরাঁ-কারে যাবো।

রঞ্জন। অঞ্জলি, একটু স'রে দাঁড়াও, মালটা নামাবে।

অঞ্জলি। দাঁড়াও, আমাকে আগে নামতে দাও।

[প্ল্যাটফর্মে]

অঞ্জলি। আঃ, বাইরে এসে বাঁচলুম। কী কাণ্ড! কী বিশ্রী ব্যাপারটা হ'লো!

শ্যামল (নীচু গলায়)। অঞ্জলি, একটা কথা। তোমাকে যা-তা সব বলেছি, বলতে হয়েছে, কিছু মনে কোরো না, মনে রেখো না। ...না, না, মনে রেখো, একটু মনে রেখো।

খাতার শেষ পাতা

[গাড়ির মধ্যে]

(নীচু গলায়)

রঞ্জন। তোমাকে দেখে খুব খুশি হলুম, মাধুরী। আশা করি, জীবনে সুখী হবে।

মাধুরী। হ্যাঁ, হবোই তো, নিশ্চয়ই সুখী হবো।

রঞ্জন। তোমার উপস্থিত বুদ্ধিটা বেশ প্রখর, তারিফ করতে হয়।

মাধুরী। শোনো—অতি বিশ্রী সব কথা তোমাকে বলেছি, রাগ কোরো না।

রঞ্জন। যাক, তবু তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো। ঐদিকে আমাদের কলকাতার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দশ মিনিটের মধ্যে দু'জনে দু'দিকে চ'লে যাবো।

মাধুরী। আমাদের জীবনটাও এইরকম, হঠাৎ দেখা হয় তারপর কে কোন্‌দিকে···

শ্যামল (বাইরে থেকে)। তোমরা নামতে বড্ড দেরি করছো, মাধুরী।

মাধুরী (চেঁচিয়ে)। এই আসছি। (নীচু গলায়) কেন এমন হয়? কেন এমন হয়?

[প্ল্যাটফর্মে]

অঞ্জলি (নীচু গলায়)। তোমাকে আবার দেখলুম এটুকুই লাভ।

শ্যামল (নীচু গলায়)। না, না, এ-কথা বোলো না, এ-কথা বোলো না।

কণ্ঠস্বর ৩। চাই সীতাভোগ মিহিদানা। মিহিদানা সীতাভোগ।

রঞ্জন। অঞ্জলি, চলো। কলকাতার গাড়ি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাড়বে।

অঞ্জলি। চলো।

রঞ্জন। আচ্ছা···যাচ্ছি আমরা।

কণ্ঠস্বর ১। পান বিড়ি সিগ্রেট, পান বিড়ি সিগ্রেট!

শ্যামল। এই বুঝি তোমার মনুষ্যত্বওলা পুরুষ!

মাধুরী। আর এই তোমার মনের মতো মেয়ে?

কণ্ঠস্বর ৩। চাই সীতাভোগ মিহিদানা!

শ্যামল। পাগল! ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বলি—

মাধুরী। তুমিও তাহ'লে ঠাট্টা করতে শিখেছো?

শ্যামল। না শিখে উপায় কী। এমন চমৎকার শিক্ষয়িত্রী!···এই যে রেস্তোরঁ-কার, ওঠো।

মাধুরী। হ্যাঁ, এসো ভালো ক'রে খাওয়া যাক। গোলমালে মাথাটা ধ'রে গেছে। কী বিশ্রী ব্যাপার।

শ্যামল। বিশ্রী!

[ঢংঢংঢং ট্রেনের ঘণ্টা বাজলো]

১৩৪৭

খাতার শেষ পাতা

খবর এলো, তার চাকরি হয়েছে।

মা বললেন, 'দু' বচ্ছর ধ'রে শিবের মাথায় রোজ ফুল দিয়েছি, এতদিনে তিনি মুখ তুলে চাইলেন।'

বোন বললে, 'আর কোনো কথা না, এবারে আমি কলেজে ভর্তি হবোই।'

ছোটো ভাই লাফাতে-লাফাতে এসে বললে, 'দাদা, একটা টাকা দাও, আজ মোহনবাগানের খেলা।'

ছোটো ভাই চ'লে গেলো খেলা দেখতে, বোন বেরিয়ে গেলো পাশের বাড়িতে তার কলেজ-পড়ুনি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে, আর সে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় একা ব'সে ভাবতে লাগলো।

তাহ'লে সত্যিই তার চাকরি হ'লো। ভাবেনি কোনোদিন হবে। আশা ছেড়ে দিয়েছিলো, মনে হয়েছিলো এই দুঃখের কালো গর্তটার মধ্যেই কাটবে সারা জীবন। বাপ অকালে মারা গেলেন, তার বয়স তখন আঠারো। তরুণ জীবনের উচ্চাশার বাতিগুলো এক ফুঁয়ে নিবে গেলো। বাপ খরচে ছিলেন, ইনসিওরেন্সের সামান্য টাকা ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেননি। একটা বাড়ি পর্যন্ত না। ঐটুকু সম্বল এই ক'বছরেই তলানিতে এসে ঠেকেছে, তবু আপন প্রাণরস দিয়ে আশাকে জীইয়ে রেখেছেন তার মা।

খাতার শেষ পাতা

বি. এ. পাশ ক'রেই চাকরির চেষ্টায় নামতে হ'লো। মুরুব্বির জোর ছিলো না; যেদিকে পা বাড়ায় সেদিকেই দেখে প্রকাণ্ড নিষেধ পাথরের দেয়ালের মতো খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে। দেখতে-দেখতে জীবনটা পুঞ্জ-পুঞ্জ ব্যর্থতায় বিষিয়ে উঠলো। এত বড়ো বিশ্বসংসারে কোনোখানেই কি তার একটু জায়গা নেই? সে কি কোনো কাজেই লাগে না?

আছে বইকি, তারও জায়গা আছে।

২

যেখানে সে কাজ করে সেটা ব্যাঙ্ক। অল্পদিন খোলা হয়েছে। বনেদি আপিস-পাড়ার কাছাকাছি একটা সরু গলির অন্ধকার কুঠুরিতে তার আস্তানা।

সারাদিন মস্ত মোটা খাতার সামনে উঁচু চেয়ারে ব'সে-ব'সে তাকে হিসেব কষতে হয়। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে কোনোদিন সন্ধ্যে, কোনোদিন বা রীতিমতো রাত।

খুব খাটুনি, মাইনে চল্লিশ টাকা। তা হোক, সে যে এ-পৃথিবীতে একেবারেই বৃথা আসেনি, এইটুকু তো জানা গেলো। উৎসাহের সঙ্গেই সে লেগে গেলো কাজে।

ফল পাওয়া গেলো প্রায় হাতে-হাতেই। এক সবজজের ছেলে এসেছিলো শখ ক'রে চাকরি করতে, হঠাৎ একদিন কী খেয়াল হ'লো, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেলো।

সেই পরিত্যক্ত চেয়ারে বসানো হ'লো তাকে। চেয়ারটা আর উঁচু নয়, কারণ পদটা উঁচু। এক লাফে আশি টাকা! সে তো অবাক।

মা বললেন, 'তাহ'লে এবার পাত্রীর খোঁজ করি?'

সে বললে, 'আগে মেয়ের বিয়ে দাও, তারপর ছেলের বিয়ের কথা ভেবো।'

৩

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ছেলেবেলায় তার কবিতা লেখার অভ্যেস ছিলো।

কে জানতো সেই অভ্যেসের ভূত আবার তার ঘাড়ে চাপবে, ব্যাঙ্কের সেই বন্ধ কুঠুরির অন্ধকারে, কোলাহলমুখরিত, মুদ্রাঝনৎকৃত দুপুরবেলায়? ব্যাঙ্কের টেবিলে ব'সে ব্যাঙ্কের কাগজেই সে হঠাৎ একটা কবিতা লিখে ফেললে।

তারপর যা হ'লো সে ভারি অদ্ভুত। তার মনে যেন কবিতার বান ডাকলো। তাকে ফেরানো যাবে না, ঠেকানো যাবে না। ভেঙে ফেললে মনের সব বাধা, চুরমার ক'রে দিলে জীবনের সব নিষেধ। কোন এক দুরন্ত নিষ্ঠুর আবেগ তার ভিতর থেকে ঠেলে-ঠেলে উঠছে, তার কাছে চরম তার নিঃসহায়তা।

তার মনে হ'তে লাগলো কথাগুলি যেন তার বুকের মধ্যে ছোটো ছেলের দলের মতো হৈ-হৈ ক'রে বলছে—খুলে দাও, খুলে দাও দরজা, বের ক'রে দাও আমাদের, আমরা যাবো খোলা হাওয়ায়, আকাশের তলায়, আলো-জ্বলা দিনের দিগন্তরেখার সন্ধানে। বন্দী করে রেখো না আমাদের, মুক্তি দাও। ছটফট করছে ওরা, মাথা খুঁড়ে মরছে, আর তার বুকের ভিতরটা শিরশির করছে, গা উঠছে কাঁটা দিয়ে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি কাগজ-কলম নিয়ে কিছু লিখে ফেলতে না-পারলে সে বুক ফেটেই ম'রে যাবে।

কিন্তু মরতে লাগলো তার বেশির ভাগ কবিতাই। সময় কোথায় যে লিখবে? ট্রামে ক'রে আপিসে যেতে-যেতে হুড়মুড় ক'রে আস্ত একটা কবিতাই প্রায় এসে পড়লো, তারপর যেই আপিসে ঢোকা, অমনি কাজের সহস্র চাকার ঘর্ষণে-নিষ্পেষণে সে যে কোথায় পালিয়ে গেলো তা কে বলবে? এ-রকম প্রায়ই হ'তে লাগলো। তা হোক, তবু আরো আছে। হাজার-হাজার হারিয়েও কয়েকটিকে ধ'রে রাখবার সময় হয় তার। আপিসেরই নানা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সে একটু-একটু ক'রে লিখে ফেলে, তারপর রাত্তিরে বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার ছোটো ঘরটিতে একা ব'সে-ব'সে একটি বাঁধানো খাতায় সেগুলিকে খুব যত্ন ক'রে তুলে রাখে।

তার কলম যখন কাগজকে স্পর্শ করে, আনন্দে তার সমস্ত প্রাণ যেন থরথর ক'রে কাঁপে। প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের প্রথম মুহূর্তটিও বুঝি এমন নয়। যৌথ পরিবারের ভিড়ের মধ্যে নব-বিবাহিত তরুণ-তরুণীর যে দুঃখ, সেই দুঃখই কি তার নয়, যখন ব্যাঙ্কের বেআব্রু ব্যবসার মধ্যে ব'সে, চারদিকের চোখ থেকে নিজেকে সাবধানে আড়াল ক'রে, তাকে চুপে-চুপে এমন সোনা তৈরী করতে হয় যার উপর পৃথিবীর কোনো ব্যাঙ্কের কিছুমাত্র লোভ নেই? কিন্তু এ কি দুঃখ, না কি অসহ্য, অসম্ভব সুখ?

এতদিনে তার মনে হ'লো এই ব্যাঙ্ক যেন কঠিন মুঠিতে তার হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরেছে, তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো। পাতালপুরীর বিষ-বাষ্পের আবিলতা শুষে নিচ্ছে তার প্রতিটি দিন। কাজে না-লাগবার ব্যর্থতা যদি দূর হ'লো, তার বদলে কি এলো সমস্ত জীবনকে বলি দেবার এই অপরিসীম হতাশা? এই অবরোধ থেকে যদি সে বেরোতে না পারে,

তাহ'লে সে বাঁচবে কেমন ক'রে? কিন্তু বেরোলেই বা বাঁচবার উপায় কী?

জীবিকার মূল্যে জীবনকে বিকিয়ে দেবার এই যে অমানুষিক ব্যবস্থা, এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিলে। আর তারই অবরুদ্ধ তাপের চাপে তার কবিতাগুলি আগুনের ফুলের মতো ফুটে উঠতে লাগলো। গভীর রাত্রে একা ব'সে-ব'সে সে তার খাতাটির পাতা ওল্টায়, কিছু লেখে, কিছু চুপ ক'রে থাকে। এখন আর কিছু নেই, এই পরিপূর্ণ নিশীথে প্রিয়ার সঙ্গে তার পরিপূর্ণ মিলন। মনে মনে বলে, 'যতদিন তুমি আছো আর-কিছু চাইনে।' কূলে-কূলে ভরা মন চোখের কোণে ছলছল ক'রে ওঠে।

৪

কিন্তু আর বেশিদিন লুকিয়ে থাকা তার হ'লো না। ধরা প'ড়ে গেলো।

ধরা পড়লো ব্যাঙ্কেই। তার পাশের টেবিলে যে-ছেলেটি ব'সে কাজ করে এই আবিষ্কারটি তারই কীর্তি। এত বড়ো একটা খবর অন্যান্য কেরানিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হ'লো না। এ নিয়ে সেদিন বেশ একটা প্রবল আলোচনা কাউন্টরে-কাউন্টরে গুঞ্জিত হ'য়ে ফিরলো। তাদের মধ্যে একজন কবি আছে, এ কি সোজা কথা!

লজ্জায় সে মাটির সঙ্গে মিশে গেলো।

আবিষ্কারক ছেলেটির অসাধারণ উৎসাহ। বললে, 'আপনি বই ছাপান।'

'বই।'

কিন্তু ছেলেটি কথাটা ওখানেই শেষ হ'তে দিলে না। কেরানিদের কাছে ঘুরে-ঘুরে সে চাঁদা তুললো। তারা সকলেই গরিব, তাই তারা যে যা পারে দিলে। সব সুদ্ধু গোটা চল্লিশ টাকা উঠলো। আর সেই টাকায় ছাপা হ'য়ে বেরুলো তার কবিতার বই; হলদে মলাট, রোগা চেহারা, এক টাকা দাম।

দেশের নামজাদা লেখকদের নামে সে একখানা ক'রে বই পাঠিয়ে দিলে। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা অনেকেই চিঠি লিখে জানালেন যে-কবিতাগুলি তাঁদের ভালো লেগেছে। একজন লিখলেন—আপনি কে? কোথায় থাকেন? কী করেন? আপনার নাম ছদ্মনাম নয়তো?

খাতার শেষ পাতা

তারপর সে বই পাঠালে নানা পত্রিকায় সমালোচনার জন্ম। সমালোচক-মহলে হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো। 'আশ্চর্য' 'অপূর্ব', 'অভিনব', এই বিশেষণগুলি স্বপ্নের মতো বোধ হ'লো তার। এ-সবের মানে কী?

একদিন বোন এসে বললে, 'দাদা, আজ আমাদের ইংরেজির প্রোফেসর তোমার কবিতার সুখ্যাতি করছিলেন।'

সে মনে-মনে ভাবলে, এ হ'লো কী? তারপর ভাবলে—এ-সমস্তই ফাঁকি, আমি কিছুই পারিনি। সবচেয়ে ভালো লেখাগুলো লেখাই হয়নি। যদি সময় পেতুম, যদি সুবিধে থাকতো, যদি সমস্ত সময় এই লেখা নিয়েই থাকতে পারতুম, তাহ'লে আরো কত ভাল হ'তো লেখা। আমার মনের মধ্যে রাশি-রাশি লেখা দিন রাত টগবগ ক'রে ফুটছে—তারা কি সব বিস্মৃতির প্রেতলোকেই মিলিয়ে যাবে, কোনোদিন কি তাদের দেহ দিতে পারবো না, নাম দিতে পারবো না?

৫

ক্রমে এমন দিন এলো যখন তার কবিখ্যাতি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরেরও কানে উঠলো। ভেবেছিলো চাকরি যাবে, কিন্তু হ'লো উল্টো। কর্তা তাকে ডেকে নিয়ে দু'চারটে মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত করলেন; শেষে বললেন, আপনার মধ্যে বেশ অ্যাবিলিটি আছে, দেখতে পাচ্ছি। মন দিয়ে কাজ করুন, উন্নতি হবে।'

পরের মাস থেকে তার মাইনে আরো কুড়ি টাকা বাড়লো।

এতটা সে আশা করেনি, অভিভূত হ'য়ে পড়লো। ডিরেক্টরের কথা শিরোধার্য ক'রে মন দিলে কাজে। রাত ন'টার আগে কোনোদিন বাড়ি ফেরে না। সকালে যেটুকু সময় পায় ব্যাঙ্কের শেয়ার বেচবার চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করে।

মনে-মনে ভেবে দেখলে, প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে সে যদি কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পারে, তাহ'লেই এই কারাগার থেকে মুক্তি সম্ভব, নয়তো সারা জীবন এখানেই তিলে-তিলে পচতে হবে, কবিতা তো মরবেই, সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও মরবে। কিন্তু কোনোরকমে একবার যদি এখান থেকে বেরোতে পারে তাহ'লে বাকী জীবন তো তার হাতে রইলো। মুক্তি-সাধনার সোপানরূপেই সে আকণ্ঠ ডুবলো তার দাসত্বে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুশি হ'য়ে বললেন, 'বাঃ, এই তো চাই! এই ব্যাঙ্ক আপনার নিজের মনে ক'রে কাজ করুন, তাতে আপনারও ভালো হবে।'

খাতার শেষ পাতা

তার মুখ দিয়ে ফস ক'রে বেরিয়ে গেলো, 'নিজের মনে করলেই তো নিজের হয় না। আমাকে পার্টনার ক'রে নিন, প্রাণ দিয়ে কাজ করবো।'

ভিতরে-ভিতরে তখন ব্যাঙ্কের অবস্থা ভালো যাচ্ছিলো না। এ থেকে উদ্ধারের কী উপায় হ'তে পারে তার ভাবনা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। দাঁতের ফাঁকে বর্মা চুরোট চেপে বললেন, 'বেশ, তা-ই হবে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে ব্যাঙ্ককে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন?'

এক বছরের মধ্যেই ব্যাঙ্ক ফেঁপে উঠলো। উঠে এলো খোদ ক্লাইভ সাহেবের রাস্তায়। মস্ত হল্-ঘর সারাদিন গমগম ঝমঝম করছে। এর মাত্র চার বছর পরে দেখা গেলো ব্যাঙ্কের নিজস্ব পাঁচতলা বাড়ি উঠেছে চিত্তরঞ্জন বীথিকায়। আনুষঙ্গিক আরো চার পাঁচটা ব্যবসার সূত্রপাত হয়েছে। খবরের কাগজগুলো ব্যাঙ্কের আধ পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে তারই পাশে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লিখলে—'বাঙালির গৌরবময় প্রতিষ্ঠান'। এত অল্প সময়ে এমন আশ্চর্য অভ্যুত্থান বড়ো একটা দেখা যায়নি। দেশশুদ্ধ লোক ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো।

কিন্তু দেশের লোক জানে না যে এর পিছনে আছে আর-একজনের জীবন-পণ-করা উদ্যম।

এই পাঁচ বছর তার কেটেছে যেন নেশার ঘোরে। তার মধ্যে যে সত্যি সত্যি এতখানি 'অ্যাবিলিটি' আছে তা কে জানতো! ব্যবসার জটিল আবর্তের মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘুরপাক খেতে-খেতে সে যে বেঁচে আছে এ-কথাটা মনে করবারও কখনো সময় হয়নি। এরই ফাঁকে-ফাঁকে গলি

থেকে বড়ো রাস্তায় উঠে এসেছে, বোনের বিয়ে দিয়েছে, ছোটো ভাইকে বিলেতে পাঠিয়েছে, নিজে বিয়ে করেছে এবং দুটি ছেলেমেয়ের পিতা হয়েছে।

আর তার কবিতা?

কবিতাকেও সে ভোলেনি। মাঝে-মাঝে সম্পাদকদের প্রবল অনুরোধ এড়াতে না-পেরে সেই খাতা থেকে দু'একটি লেখা পাঠিয়ে দিয়েছে; কোনো এক ছুটির দিনে নিজের জমকালো ড্রয়িংরুমে নামজাদা সাহিত্যিক-দের ডেকে চা-ও খাইয়েছে। কখনো-কখনো নতুন লেখাও ঝিলকিয়ে উঠেছে তার মনে; কিন্তু লিখবে কখন? যখন গরিব ছিলো তখনও সময় ছিলো না, এখন বড়োলোক হয়েছে, এখনও সময় নেই। আচ্ছা, এদিকটা একবার সামলে নিক তো—তারপর মনের মতো ক'রে বাঁচবে।

এখনো তার বয়স অল্পই, সমস্ত জীবন এখনো তার সামনে পড়ে। যাক না আরো কিছুদিন।

আরো কিছুদিন গেলো। তারপর তাকে দেখা গেলো লেকের ধারে নিজের মনোরম ভবনে। অবশ্য সে-বাড়িতে রাতটুকু ছাড়া খুব অল্প সময়ই সে কাটাতে পারে, কেননা সকালবেলা চা খেয়েই বেরিয়ে যায়, আর ফেরে কখন তার কিছুই ঠিক নেই।

যা-ই হোক, বাড়িটি তার। পিচ্ছিল ভাগ্যকে সে বেঁধেছে, গড়েছে নিজের হাতে, দারুণ শক্তি দিয়ে তাকে রচনা ক'রে নিয়েছে। এখন সে নিশ্চিন্ত, সে নির্ভীক, সে স্বাধীন।

এবার বুঝি তার সময় এলো।

৬

একদিন অনেক রাত ক'রে বাড়ি ফিরে সে দেখলো তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। শিয়রে জ্বলছে ঢাকনা-পরানো মৃদু আলো, হাতের কাছে একখানা বই উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে। কী মনে হ'লো, আস্তে বইখানা তুলে নিলে। আরে, এ যে তারই সেই কবিতার বই। পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগলো—তাই তো, সে তো ভালোই লিখতো। নিজের অজান্তেই ডুবে গেলো স্বপ্ন-সত্তা নবযৌবনে; রাত্রির হৃৎপদ্ম থেকে কোন এক জন্মান্তরের স্মৃতিসৌরভের মতো উঠে এসে তাকে আচ্ছন্ন করলে।

নিঃশব্দে সে বেরিয়ে এলো বাইরের খোলা ছাদে। আকাশের শুভ্র চাঁদ লেকের জলে অপ্সরী হ'য়ে নেমেছে।

ঐ আকাশ একদিন তার ছিলো; এই হাওয়া একদিন গান হ'য়ে তার বুকে দোলা দিয়েছে। আজ তার কিছুই কি বাকি নেই?

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সারাদিনের ক্লান্তির ভারে গাড়িতেই সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু এখন মনে হ'লো সে যেন আকাশের তারার মতোই নিদ্রাহারা। মনে পড়লো তার জীবনের প্রতিজ্ঞা। সে যা চেয়েছিলো সবই তো পেয়েছে, তবে আর দেরি কেন? না, দেরি করবে না, কথা রাখবে সে। এখনো সময় আছে।

ঘরে ফিরে গিয়ে বহুকাল পরে সে সেই বাঁধানো খাতাটি বের করলে, হাতে নিলে কলম।

খাতার শেষ পাতা

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে স্ত্রী চমকে উঠে বললে, 'এ কী! কখন এলে?'

সে কোনো জবাব দিলে না।

স্ত্রী আবার বললে, 'খেয়ে এসেছো বুঝি? শোবে না?'

সে সংক্ষেপে শুধু জবাব দিলে, 'না।'

স্ত্রী ভালো ক'রে একবার তাকিয়ে দেখলে, আর-কিছু বললে না। স্তব্ধ রাতের ঘুম-ভাঙা মুহূর্তে সুখে কেঁপে উঠলো তার বুক। ছেলেবেলা থেকেই লেখকদের সম্বন্ধে তার অহেতুক ভক্তি, এবং যেহেতু স্বামীকে সে কখনো কবি-রূপে দেখেনি, এই ভক্তিতে চিড় ধরবার কোনো কারণ ঘটেনি তার। আজ প্রথম সে দেখলো স্বামীর কবি-মূর্তি, দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। নিজেকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে চোখ বুজে প'ড়ে রইলো, কিন্তু ঘুম আর এলো না। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, স্বামীর হাতে কলম, মুখে সিগারেট, কপালে অভিনিবেশের রেখা।

রাত বাড়লো, চাঁদ পশ্চিমে। এতক্ষণ সে কী করেছে?

ছাইদানে জমেছে অনেকগুলি সিগারেটের ভস্মাবশেষ, আর তার খাতার পাতায় অসংখ্য বিচিত্র কাটাকুটি ক্রমশ একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর আকৃতি ধারণ করছে। নেই, কথা নেই। তার মুখ জ্বেলে উঠলো, চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে নির্মম প্রতিজ্ঞার শরাসনে সে চুপ করে ব'সে। আছে, আছে সে হারায়নি—তাকে ফিরিয়ে আনবো। লুকিয়ে আছে এই রাত্রির বুকের তলায়, ছড়িয়ে আছে তারায়-তারায়, মিশে আছে আমারই হৃদয়-রক্তে। সে আছে, সে যায়নি, সে এখনি আসবে।

খাতার শেষ পাতা

খাতার উপর ধাঁ ক'রে সে একটা লাইন লিখে ফেললে—এই নিয়ে বুঝি কুড়ি বার হ'লো। দশ মিনিট চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো, তারপর আরো একটা সিগারেট ধরিয়ে সেই লাইনটার উপর আস্তে-আস্তে কলম বুলিয়ে-বুলিয়ে উপরের কাটাকুটির সঙ্গে তাকে জুড়ে দিলে। জন্তুটার যেখানে চারটে পা ছিলো, সেখানে হ'য়ে গেলো ছ'টা।

নিচের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বাজলো তিন। স্ত্রী চোখ মেলে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওগো, শোবে না?'

চমকে চোখ তুলে তাকালো সে। চারদিকে তাকিয়ে যেন ফিরে এলো তার পরিচিত অভ্যস্ত জগতে। নিঃশ্বাস ছেড়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলে। বললে, 'যাচ্ছি।'

স্ত্রী উঠে এসে চুপি-চুপি বললে, 'কী লিখলে একটু দেখবো?'

স্ত্রীর চোখের দিকে সে শূন্য দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে রইলো, তারপর ঠাশ ক'রে খাতাটা বন্ধ করে দিলে।

অনুনয় ক'রে বললে তার স্ত্রী, 'একটু দেখি না।' হাত বাড়াতে যাচ্ছিলো খাতাটার দিকে, কিন্তু সে খপ ক'রে সেটা তুলে নিলে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে দেরাজের গভীর গহ্বরে। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ও-খাতা আর খুলবো না।'

১৩৫০

গাইতেই হয়, তাহ'লে তার জীবন-নেপথ্যে যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো, সে কি ছিলো না ?

—জীবন-নেপথ্যে পদধ্বনি ? সে আবার কী ?

—ওর মা ওর বিয়ের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন নানা দিকে, কিন্তু মনের মতো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না। মামীমাকে বলতে শুনতুম— 'আহা! এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন—মেয়েটা বি. এ. পড়ছে পড়ুক না— ঠিক সময়ে ওর বিয়ে হ'য়ে যাবে, দেখো।' কিন্তু তাঁর মা বলতেন, 'লোকে একটু আগে থেকেই চেষ্টা করে—মেয়ের বিয়ে কি সোজা কথা!'

একদিন ওর মা আমাকে বললেন, 'তোমার তো কত ছেলের সঙ্গে জানা-শোনা, মেয়েটার একটা হিল্লে ক'রে দিতে তুমিই তো পারো।'

মামী হেসে বললেন, 'হ্যাঃ, ভালো লোককেই বলেছো! দোকানে গিয়ে একটা জিনিস চাইতে হ'লে যে সাত বার ঘেমে ওঠে, সে দেবে তোমার মেয়ের বিয়ে! তবে ওর সন্ধানে একজন খুব সুপাত্র আছে বটে,' ব'লে মামীমা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন।

ওর মা সাগ্রহে বললেন, 'কে? কোথায় থাকে সে? করে কী?'

আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালুম না। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায়। আমার সমস্ত মুখে তখনো পিন ফুটছিলো। ছি ছি, মামীমা আমাকে এই মনে করেন!

আমার মনের মধ্যে যে কী লজ্জা ঢুকলো তা আর বলবার নয়। কেমন ক'রে আমি প্রমাণ করতে পারি যে সুষমার আকর্ষণেই আমি ওখানে যাই না? কেমন ক'রে বোঝাতে পারি যে আমি এত অভদ্র নই যে মামীমার অকৃপণ স্নেহের অন্যায় অপব্যবহার করবো? আগেও

ঘন-ঘন যেতুম ওখানে, এখনো যাচ্ছি। আমার ব্যবহারে কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? আমি কি ওঁদের এ-রকম ভাববার কোনো কারণ দিয়েছি? নিজের মনকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলুম—মনে হ'লো হয়তো কোনো ভুল করেছি, হয়তো কোনোদিন কোনো কথায়, কোনো ভঙ্গীতে নিজের অজান্তেই এমন-কিছু প্রকাশ ক'রে ফেলেছি, মামীমার মেয়ে-মনের সূক্ষ্ম পরদায় যা চট ক'রে ধরা পড়েছে। সেটা কবে হ'লো, কেমন ক'রে হ'লো, তা কিছুতেই মনে করতে না-পেরে আমার মনের যন্ত্রণা আরো বেড়েই গেলো।

আমার মন বললে, এ-অপবাদ থেকে তোমাকে মুক্ত হ'তেই হবে, যেমন ক'রে হোক।

ও-বাড়ি যেতে আমার পা আর সরছিলো না, কিন্তু ভেবে দেখলুম হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে সেটাও চোখে পড়বার মতো হবে। আসা-যাওয়ার পালাটা একরকমই রেখে মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, কী করা যায়। হঠাৎ মনে হ'লো আমি যদি সত্যি-সত্যি সুষির একটি পাত্র জুটিয়ে দিই, তার চেয়ে ভালো কিছু আর হ'তে পারে না। তাই তো, এই অত্যন্ত সহজ কথাটা আমার এতদিন মনে হয়নি কেন?

ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই সুকুমারের সঙ্গে আমার দেখা। এম. এ.-তে আমার সঙ্গে পড়তো, সম্প্রতি বি. সি. এস.-এর বেড়া ডিঙিয়ে খুলনায় ডেপুটিরূপে অধিষ্ঠিত। দু'দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলো কলকাতায়, চায়ের দোকানে আমার সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় যেই জানলুম যে সে এখনো বিয়ে করেনি, মনটা আমার লাফিয়ে উঠলো।

'আমার জানাশোনা খুব একটি ভালো মেয়ে আছে। যদি বিয়ে করো এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

কলেজে পড়বার সময় আমার সম্বন্ধে অহেতুক একটা শ্রদ্ধা ছিলো সুকুমারের। আমাকে বললে, 'বেশ তো।'

তার সঙ্গে কথাটা তখনই অনেকটা এগিয়ে রাখলাম। আমি বললুম, 'সামনের মাসে তো মহরমের ছুটি পড়েছে, তখন এসে মেয়েটিকে একবার দেখে যেতে পারো।'

'না, না, আমি আর কী দেখবো। তুমি ভালো বলছো, সেইটেই যথেষ্ট। আর ঐ মেয়ে দেখা ব্যাপারটা আমার কাছে বর্বরোচিত বোধ হয়। তবে আমার মা বোধহয় একবার—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমার মা একবার দেখবেন বইকি!'

সুকুমার বললে, 'এখন থেকে তো মফস্বলে-মফস্বলে ঘুরতে হবে; বিয়ে না-করলে দিন কাটতে চায় না।'

সুকুমারের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হলুম। যদিও ডেপুটি হয়েছে, মনুষ্যোচিত ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দেয়নি। সুষিকে সুখী করতে পারবে।

পরের দিন নিভৃতে মামীকে বললুম কথাটা। মামী একটু যেন অবাক হ'য়ে বললেন, 'তুমি ঠিক বলছো, সুমন?'

'ঠিক মানে? সুকুমার এমন ছেলে নয় যে খামকা কোনো কথা বলবে। তোমাদের যদি অমত না হয় সামনের এই আষাঢ় মাসেই বিয়ে হ'য়ে যেতে পারে।'

মামীমা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বেশ

তো।' তাঁর দিক থেকে যতটা উৎসাহ আশা করেছিলুম ততটা যেন দেখা গেলো না।

কিন্তু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন সুষির মা। আমাকে হাতে ধ'রে বললেন, 'এটা তোমাকে ঠিক ক'রে দিতেই হবে ভাই, এমন পাত্র ফসকালে আর পাওয়া যাবে না।'

দেখতে-দেখতে সুষির বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলো। বাংলা দেশে এত সহজে কোনো মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়, এ যেন কল্পনাও করা যায় না। মনে হ'লো, উভয় পক্ষ পরস্পরের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো, শুধু মাঝখানে কেউ এসে পরিচয়ের সূত্রটি ধরিয়ে দেবার অপেক্ষা। আমি সেই মধ্যবর্তীর কাজ করলুম, আত্মীয়মহলে আমার ধন্য-ধন্য প'ড়ে গেলো। আমার মতো অপদার্থকে দিয়ে এত বড়ো একটা কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে, এ কথা কে ভাবতে পারতো!

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধালো সুষমা নিজে। শোনা গেলো সে বেঁকে বসেছে, বিয়ে করবে না।

মামীমা আমাকে বললেন, 'এখন যাও, বোঝাও গিয়ে সুষিকে।'

আমি আকাশ থেকে পড়লুম।—'সে কী! আমি কী বোঝাবো!'

'তুমি বললেই কাজ হবে। তোমাকে ও মনে-মনে খুব ভক্তি করে তা তো জানো!'

আমি লাল হ'য়ে উঠে বললুম, 'কী বাজে বকছো!'

কিন্তু মনে-মনে আমি চিন্তিত বোধ করলুম। বিয়েটা এতদূর এগিয়ে এখন যদি ভেস্তে যায়, আমারই পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হবে। সুষি কী ভাবছে কে জানে, কিন্তু সুকুমারের মতো সব দিক দিয়ে

বাঞ্ছনীয় পাত্রকে সে খামকা প্রত্যাখ্যান ক'রে বসবে সে কি এতই বোকা?

সুষির বিয়ে ঠিক হবার পর ওর সম্বন্ধে আমার সংকোচ খানিকটা কেটে গিয়েছিলো। মাঝে-মাঝে হু'একটা কথা বলতুম, এমনকি একদিন পরোক্ষে একটুখানি ঠাট্টাও করেছিলুম। ঠাট্টাটা খুবই নিরীহ, কিন্তু সুষি এমন অসামান্যরকম লাল হ'য়ে উঠেছিলো যে তার পরে আর কোনোরকম পরিহাসের অবতারণা করতে ভরসা পাইনি।

সুষিকে পাওয়া গেলো দোতলার কোণের ঘরে, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। আমি কুণ্ঠিতভাবে বললুম, 'সুকুমার তোমার প্রতীক্ষা করছে, এখন তুমি যদি স'রে দাঁড়াও তাহ'লে ওর মনে অন্যায়রকম আঘাত দেওয়া হয়।'

তার কালো চোখ মুহূর্তের জন্য আমার মুখের উপর এসে পড়লো। তারপর চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'আর আমার মন?'

'কেন, তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা আছে?'

ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠলো তার কুমারী কপোল। মাথা নীচু ক'রে শাড়ির আঁচলটা একবার আঙুলে জড়ালো, একবার খুললো।

আমি বললুম, 'তুমি আর কোনো গোলমাল করবে না, এই কথা আমাকে দাও।'

সে চোখ তুলে বললে, 'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি।'

সুষমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। ভাবলুম, বিয়ের আগে মেয়েদের মন

খারাপ হবেই। যেখানে জন্মালো, যেখানে বড়ো হ'লো সেই সমস্ত পরিবেশ হঠাৎ একদিনে ছেড়ে যাওয়া কি সোজা কথা!

আষাঢ় মাসের সতেরো তারিখে ওদের বিয়ে হ'য়ে গেলো। সেদিন বাড়ি ভরা লোকজন—হৈ-চৈ। আমি খুব ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিয়ের লগ্ন আসন্ন, বর এসেছে, এমন সময় কী একটা কাজে মামীকে খুঁজতে-খুঁজতে দিশেহারা হ'য়ে দোতলার সেই কোণের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। মহিলার দল সুষিকে ঘিরে ব'সে আছেন। তার পরনে ফিকে গোলাপি রঙের বেনারসি, কপালে চন্দন, পায়ে টুকটুকে আলতা। বসেছে উঁচু-করা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে, চোখের দৃষ্টি আনত। ভারি সুন্দর লাগলো, অন্যমনস্কভাবে একটু বেশীক্ষণই বোধ হয় ওর দিকে তাকিয়ে ছিলুম।

ওর মা আমাকে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।—'এসো ভাই, এসো। তোমার জন্যেই তো সব হ'লো, তোমার কথা চিরকাল মনে থাকবে। সুষি, সুমনকে প্রণাম কর্।'

এই আকস্মিক সম্মানলাভে আমি এমন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলুম যে বোকার মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইলুম। সুষি আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলুম তার চোখে আরক্তিম আভা—একটু আগে বোধহয় কাঁদছিলো।

আমার চোখের উপর চোখ রেখে অস্ফুটস্বরে বললে, 'আপনার মনে এই ছিলো!'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। আস্তে-আস্তে নীচে নেমে এলুম।

খাতার শেষ পাতা

—তারপর।

—আর কিছু নেই। এই শেষ।

—সুষমার সঙ্গে পরে আর তোমার দেখা হয়নি?

—বিয়ের দশ দিন পরে সুকুমার বৌকে নিয়ে চ'লে গেলো খুলনা। তার পর এই আট বছর, ও কখনো বাগেরহাট, কখনো মেহেরপুরে, কখনো নোয়াখালিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদিকে মামাও হঠাৎ চাকরি নিয়ে দিল্লী চ'লে গেলেন, আমাকেও কাজে-কর্মে বাঁধা পড়তে হ'লো।

—একবারও আর দেখা হয়নি?

—একবারও না। প্রথম-প্রথম সুকুমার আমাকে বার-বার ক'রে লিখতো, ওদের ওখানে একবার যেতে; আমিও প্রায়ই ভাবতুম যাবো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হ'য়ে ওঠেনি। একবার স্বামীর খামের মধ্যে সুষি আমাকে একটা লম্বা চিঠি লিখেছিলো। আত্মহারা আনন্দের অমন নির্জলা উচ্ছ্বাস আমি কখনো কোনো সাহিত্যের বইয়ে পড়িনি। সত্যি ওরা খুব সুখী হয়েছিলো।

—আমি যদি সুষমাকে একবার দেখতুম তাহ'লে বেশ হ'তো। তুমিও তো ওদের একবার আমাদের এখানে আসতে বলতে পারতে।

—কী যেন, মনে হয়নি তো কখনো। ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, আজ হঠাৎ কাগজে ওর মৃত্যুসংবাদ দেখে এত কথা মনে পড়লো।

—কিছু মনে কোরো না, কিন্তু সত্যি তুমি বড্ড বোকা ছিলে।

—এখনো তাই-ই আছি। মাঝে শুধু একটা কাজে কিছু বুদ্ধির প
দিতে পেরেছিলুম।

—কী সেটা?

—তোমাকে বিয়ে করা।

১৩৫০

দাঁত

—মেয়েদের পরম অস্ত্র তো দাঁত—তা ছাড়া আর কী ?

সুপ্রভা-দির কথাটা শুনে আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। কোন গূঢ় অর্থ আছে, নিশ্চয়ই। সুপ্রভা-দি কখনো খামকা কথা বলেন না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আমরা—টিচাররা পর্যন্ত মনে-মনে তাঁকে একটু ভয় করতুম, মেয়েদের কথা ছেড়েই দিলুম। সমস্ত হস্‌টেলটা যেন তাঁর উপস্থিতির ভারে থমথম করতো। আমরা, যাদের বয়েস কম, একটা চলনসই বিয়ের সুযোগ পেলেই মাষ্টারনিগিরী ছেড়ে দেবার আশা যাদের এখনো আছে—আমরা পারতপক্ষে তাঁর কাছে ঘেঁষতুম না। তাঁর চোখের দিকে তাকালেই মনে হতো যেন আমাদের মনের ভিতরটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন, বিকেলে বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে আমরা কী আলাপ করি, রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কী ভাবি—সবই যেন তিনি টের পাচ্ছেন, এবং অপছন্দ করছেন। একটু যেন লজ্জাই করতো, সত্যি বলতে।

চারুশীলার দাঁত-ব্যথা হয়েছে, সে-রাত্রে খাবার টেবিলে সে ছিলো অনুপস্থিত। সুপ্রভা-দি সেটা লক্ষ্য করলেন, তীক্ষ্ণভাবেই লক্ষ্য করলেন। হস্‌টেলের কারো অসুখ করা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তাঁর স্বাস্থ্য ছিল ভীতিকররকম ভালো। কখনো মাথাটি ধরতো না। এ বয়সে দাঁতের কোনোরকম অসুখ করা যে অত্যন্ত অন্যায়, চারুশীলা দাঁতের

ভালোরকম যত্ন নেয় না ব'লেই যে ও-রকম হয়, দাঁত ভালো রাখবার দিশি ও বিলিতি, পুরোনো ও আধুনিক উপায়ের মধ্যে কোন্‌গুলো শ্রেষ্ঠ, এ-সব নিয়ে খেতে ব'সে সারাক্ষণ তিনি বক্তৃতা করলেন। আমরা গুটিছয়েক মেয়ে মাথা নীচু ক'রে শুনছিলুম। ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো—মনে হচ্ছিলো, দাঁতের অসুখের বিরুদ্ধে তাঁর যেন ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ আছে। অথচ তাঁর নিজের দাঁত এমন চমৎকার যে আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যে সে-জন্য তাকে মনে-মনে একবার অন্তত ঈর্ষা না করেছে।

শেষটায়, অন্য-সব কথা ব'লে তিনি উপসংহার করলেন :

—তোমাদের, বিশেষ ক'রে, দাঁত সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধানী হওয়া উচিত। মেয়েদের পরম অস্ত্র তো দাঁত—তা ছাড়া আর কী?

একটু চুপচাপ। একটু অস্বস্তি। খাওয়া শেষ ক'রে আমরা উঠতে পারলে বাঁচি। হঠাৎ, যেন নিজেরই অনিচ্ছা-সত্ত্বে নীলিমা ব'লে ফেললো, এ-কথা কেন বলছেন?

—দাঁত দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়। আজকালকার মেয়েরা ছোরা শিখছে—দাঁতে ধার আর জোর থাকলে অনেক বেশি কাজে লাগে।

অত্যন্ত শান্ত সাধারণ ভাবে সুপ্রভা-দি কথাগুলো বললেন। আমাদের দু'একজনের মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু এটা আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিলো। পুরুষ জাতির উপর সুপ্রভা-দির যে মজ্জাগত ঘৃণা, সেটা কোনো রাসায়নিকে পরিণত করতে পারলে সমস্ত পৃথিবীকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দ্রবীভূত করা যেতো। তাঁর ধারণা, পুরুষেরা কতকগুলো বুনো জানোয়ার; আঁচড়াতে, কামড়াতে, ছিঁড়তে, নষ্ট করতে

ধ্বংস করতে সর্বদাই প্রস্তুত—তাদেরকে যে এমন অনায়াসে পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাই আশ্চর্য্য। তাঁর এই পুরুষবিদ্বেষের কথা আমরা জানতুম—সকলেই জানতো। সেটা তিনি গোপন করবার কোনো চেষ্টা করতেন না। সেজন্য তিনি বিখ্যাতই ছিলেন। বলতে গেলে বয়সে তাঁর ত্রিশ আর পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি অনির্দেশ্য রাজ্যে যেখানটায় এসে যৌবন ঢ'লে পড়তে আরম্ভ করবার আগে খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। মুখে দু'একটা রেখা পড়েছে; কিন্তু শরীরের বাঁধুনিতে এখনো এতটুকু ঢিল ধরেনি। কোনো পুরুষের পশু-হাত তাঁর সৌন্দর্য্যের মন্দিরচূড়া লুণ্ঠিত ক'রে দিতে পারেনি, বিস্রস্ত, বিপর্যস্ত ক'রে দিতে পারেনি তার সুসমঞ্জস স্থাপত্য। নিঃসঙ্গতায় নিষ্ফলতায়, তিনি দীপ্তিময়ী। বিয়ের প্রতিযোগিতায় এখনো ইচ্ছে করলেই আমাদের অনেককেই হারিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু সুপ্রভা-দির বিয়ের চাইতে প্রলয়পয়োধিজলের কথা ভাবা সহজ। সাধারণত যে-সব মেয়ে মাষ্টারি কি অন্য কোনো কাজ অবলম্বন ক'রে অবিবাহিত জীবন কাটিয়ে দেন, তাঁদের কোনোখানে থাকে একটা দুর্বলতা, ইংরিজিতে যাকে বলে একটা 'অতীত'। কিন্তু সুপ্রভা-দি সম্বন্ধে কেউ কখনো কোনো কথা রুদ্ধস্বরেও উচ্চারণ করেনি। তাঁর সমস্ত জীবন নিরবচ্ছিন্ন কৌমার্যের একটা শুভ্রতা—তাতে তিলমাত্র সন্দেহের কলঙ্ক নেই, কোন গুজবের, কোনো আন্দাজি কথার। এতটুকু ফাঁক ছিলো না যা দিয়ে মিথ্যা কোনো কলঙ্ক রটতে পারে। তাঁর জীবনে কখনো কোনো পুরুষ আসেনি—ও-সব জিনিসের প্রতি তাঁর স্বভাবে এমন তীব্র, অনতিক্রম্য একটা বিতৃষ্ণা ছিলো যে তাকে ব্যাধি ব'লে সন্দেহ করা যায়। বোধ হয় আজকাল-

কার দিনে বিখ্যাত কোনো একটা পর্ভর্শন—কে জানে? আমি প্রায়ই তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল অনুভব করেছি—না ক'রে পারিনি।

আমাদের সবাইকে চুপ দেখে সুপ্রভা-দি আবার বললেন, দাঁতে ধার দিয়ে রাখলে অনেক সময় কাজে লাগতে পারে। ব'লে সংক্ষিপ্ত, তিক্তভাবে হেসে উঠলেন।

কথাটা শুনে আমাদের অনেকেরই হাসি পেলো, মুখ নীচু ক'রে আমরা তা গোপন করলুম। শুধু নীলিমার ঠোঁট একটু বেঁকে গেলো।

—তাহ'লে বড়ো বড়ো নখ রাখতেই বা দোষ কী?

—হাসছো? কিন্তু জন্তুকে জন্তুর অস্ত্রেই মারতে হয়।

আমাদের খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো—আমরা উঠি-উঠি করছিলাম। বলা বাহুল্য, পুরুষজাতি সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবটা একটু অন্য রকম ছিলো: আলোচনাটা ঠিক রুচিকর ঠেকছিলো না।

—একবার রেলগাড়িতে একটা ব্যাপার হয়—

—ওঃ, খবরের কাগজে তো কত আজগুবি খবরই বেরোয়! নীলিমা ফস্ ক'রে ব'লে উঠলো।

সুপ্রভা-দি নীলিমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ব্যাপারটা ঘটেছিলো আমার।

—ওঃ! নীলিমার মুখ স্পষ্টত একটু ম্লান হ'য়ে গেলো, সে আ[illegible] কী বলবে ভেবে পেলো না।

—কী হয়েছিলো, সুপ্রভা-দি? আমি জিজ্ঞেস করলুম। সুপ্রভা দির মুখ থেকে তাঁর নিজের জীবনের কোন ঘটনা খুব কমই শুনতে পেতুম।

খাতার শেষ পাতা

—একবার রেলগাড়িতে—

সুপ্রভা-দি একটা গল্প বললেন। শীতের রাত; এক জায়গায় বসলে চট্ ক'রে আর উঠতে ইচ্ছে করে না, তাঁর কথা শোনবার জন্য আমরা সবাই আরো একটু নিবিড় হ'য়ে বসলুম। ঝি বাসনগুলো নিতে এলো, গেলাশের জলে হাত মুখ ধুয়ে আমরা আঁচলের নীচে হাত গরম করতে লাগলুম। বেশ আরামই লাগছিলো; তার উপর, সুপ্রভা-দির প্রথম কথাতেই কেমন একটা আবহাওয়া তৈরী হ'য়ে উঠেছিলো—ওঠবার যেন কারোরই আর তাড়া নেই।

সুপ্রভা-দি বললেন:

—একবার পাটনা কি মজঃফরপুর কি পশ্চিমের অমনি কোনো শহর থেকে কলকাতায় ফিরছিলুম। একা। টিকিট ছিলো সেকেণ্ড ক্লাসের। আমাদের সঙ্গে মেয়েদের কামরায় একজন ফিরিঙ্গি নার্স উঠেছিলো, সে মাঝামাঝি এক ষ্টেশনে নেমে গেলো। কামরায় আমি একা। গাড়ি ছুটে চলেছে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে। রাত বাড়ছে, ঘুমোনো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ভালো ঘুম হচ্ছিলো না—থেকে থেকে থামকা জেগে উঠছিলুম।

এক সময় জেগে উঠে দেখি একটা ষ্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। ষ্টেশনটার নাম মনে নেই। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলুম, মনে আছে দুটো বেজে গিয়েছিলো। কখন ভোর হবে, কখন কলকাতায় পৌঁছবো। বেশিরাত্রের হাওয়ায় আমার একটু একটু শীত করছিলো।

মিনিট খানেকের মধ্যেই গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করলো।

খাতার শেষ পাতা

প্ল্যাটফর্ম যখন প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ আমার কামরার দরজা খুলে গেলো, আর ব্যস্তসমস্তভাবে তার মধ্যে ঢুকে পড়লো একটা লোক।

আমি ছিলুম আধ শোয়া অবস্থায়, তাড়াতাড়ি খাড়া হ'য়ে উঠে বসলুম। বললুম, 'আপনার ভুল হয়েছে, এটা মেয়েদের গাড়ি।'

লোকটা বাইরে হাত বাড়িয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে খুব সহজভাবে বললে, 'না, আমার ভুল হয়নি।'

আমি আবার বললুম, 'এটা মেয়েদের গাড়ি।'

'সেইজন্তেই তো—' লোকটা হাসলো; ম্লান হলদে আলোয় ঝল্‌সে উঠলো তার শাদা দাঁত।

ছেলেবেলা থেকেই আমার স্নুর্ভ্‌ অসাধারণ। ইঁদুর, আরশোলা কি টিকটিকি দেখে আমি কখনো ভয় পাইনি। যারা তাদের দুর্নাম করে, তাদের জানা উচিত যে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে জীব, তারা দেখতে অনেকটা মানুষেরই মতো।

আমার সামনে দাঁড়ানো মনুষ্যমূর্তির দিকে আমি ভালো ক'রে তাকালাম। বাঙালি, সন্দেহ নেই। চুড়িদার পা-জামা আর ঢোলা পাঞ্জাবি পরা। চুলের টেড়ি নিখুঁত। সংসারে ঐ রকম শরীর আর মুখ সুন্দর নামে চলে। গায়ের রঙ ফর্শা—বড়ো বড়ো কালো চোখে খানিকটা উদ্ধত ভাব, খানিকটা হাসির আভাস।

তার দীর্ঘ, ক্ষীণ শরীরে মৃদু একটু ঝাঁকুনি দিয়ে সে আমার দিকে এগিয়ে এলো। দাঁড়ালো উপরের বার্থে এক হাত রেখে, কোমরে

ঢিল দিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গীতে। রাত্রির জমাট অন্ধকার কেটে গাড়ি তখন পুরো বেগে ছুটে চলেছে।

মনে-মনে আমি একটুখানি ভেবে নিলুম। সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু নাই। টাকাকড়ির মধ্যে দশ টাকার একটা নোট আর কিছু খুচরো—বালিশের তলায় আছে আমার হাতব্যাগ, তাতে রয়েছে। হাতে একটা আংটি ছিলো আর গলায় হার। ছোটো একটা স্যুটকেসে কিছু কাপড়চোপড়—সামান্যই তার দাম।

বালিশের তলা থেকে আমি ভ্যানিটিব্যাগটা বের ক'রে আনলুম! উপুড় ক'রে সেটা ঢেলে দিলুম লোকটার চোখের সামনে। সতেরো টাকা কয়েক আনা বুঝি হ'লো। তারপর সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'টিকিটটা ছাড়া কিছুই রাখলাম না। আশা করি পরের ষ্টেশনে গাড়ি থামবার আগেই তোমার নেমে যাবার সুবিধে হবে। পাশে অন্য গাড়ি রয়েছে। কোনো রকম গোলমাল করবার দরকার নেই।'

লোকটা বিভিন্ন মুদ্রার সেই ছোট স্তূপের দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না।

'যদি কিছু মনে না করো,' একটু পরে আমি বললুম, 'তাহ'লে ষ্টেশন থেকে বাড়ি ফেরবার ট্যাক্সিভাড়াটা রেখে দিতে পারি।'

সে আস্তে-আস্তে নোটটা, আর খুচরোগুলো একহাত দিয়ে অন্য হাতের তেলোর মধ্যে তুলতে লাগলো—যেন গুনে গুনে। আমার হাতব্যাগটা পাশে প'ড়ে ছিলো—সেটা তুলে নিয়ে ভ'রে রাখতে লাগলো তার মধ্যে।

• আমি বললাম, 'ওতে আমার টিকিটটা রয়েছে।'

কোনো কথা না ব'লে সে ব্যাগটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নাও।'

মুহূর্তের জন্য আমি তাকালুম তার মুখে। তারপর বললাম, 'চলতি গাড়িতে ও-রকম ক'রে উঠে তুমি যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছো, এই নাও তার পুরস্কার।' ব'লে আমি আঙুল থেকে আংটিটা খুলতে লাগলাম। কোমরের উপর এক হাত রেখে, শরীরের উপরের অংশ একটু পিছনে হেলিয়ে দিয়ে লোকটা নাটুকে ঢঙে হেসে উঠলো।

আমি থমকে গেলাম। তারপর আস্তে-আস্তে বললাম, 'আমার গলার হারটা একজনের চিহ্ন। টাকা হিসেবে এটার দাম খুব বেশি নয়, কিন্তু আমার কাছে এটা অমূল্য। তবু—আমার কাছ থেকে একটা চিহ্ন হিশেবে, তুমি এটা রাখতে পারো। পাশের কোনো কামরায় হয়তো কোনো বার্থ্ খালি আছে—সেখানে তুমি ঘুমোতে পারো বাকি রাত।'

হার খোলবার জন্য আমি গলায় হাত দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আঙুল-গুলো নিশ্চল হ'য়ে গেলো—'কেমন আছো, সুপ্রভা?'

আমি চোখ তুলে তাকালাম। তার ঠোঁটের কোণ হাসিতে বাঁকানো। একটু-একটু যেন মনে পড়তে লাগলো।

—'কী, চিনতে পারছো?'

'আঃ, তোমার জন্যেই না ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরা অসম্ভব হ'য়ে উঠছিলো?'

'কিন্তু বিধাতার উদ্দেশ্য অন্যরকম—দেখতেই তো পাচ্ছো।'

আমি একটু চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। দস্তুরমতো ক্রাইম—কী বলো?'

'সুপ্রভা: প্রেমই তো একটা ক্রাইম।'

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে অসহ্য ঘৃণার একটা স্রোত যেন কিলবিল্ ক'রে নেমে গেলো। নিষ্ঠুর স্পষ্টতায় সব মনে পড়লো—এই লোকটার রাস্তার ধারে, ইস্কুলের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা, যেন সমস্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকা, পিছন থেকে নানারকম অপবাক্য নিক্ষেপ করা, পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়ারদের নিয়ে হল্লা করা। আমি তখন বাগবাজারের একটা ইস্কুলে কাজ করছি। শুনতে পেয়েছিলাম, লোকটা পাড়ারই এক বড়োমানুষের ছেলে। আমি অবাক হইনি—পুরুষ মানুষের কাছে এই তো আশা করা যায়। আমি কোনরকমেই বিচলিত হইনি—পায়ের তলার মাটিকে মানুষ যতটা করে, আমি কখনো এ-সব ব্যাপারকে ততটাও লক্ষ্য করিনি।

'সুপ্রভা: আমি কি তোমার পাশে একটু বসতে পারি!'

নিজেরই অজান্তে আমি একবার উপর দিকে তাকালাম। গাড়ি থামাবার তারটা গাড়ির গতির সঙ্গে-সঙ্গে দুলছে। একবার যদি উঠে দাঁড়াতে পারি, যদি—

'গাড়িটা আজ এমনিই দশ মিনিট লেট,' আমার ব্যর্থের এক পাশে ব'সে লোকটা বলতে আরম্ভ করলো, 'খামকা আরো দেরি করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া গায়ের জোর প্রয়োগ করতে আশা করি তুমি আমাকে বাধ্য করবে না। ও সব জবরদস্তি আমার ভালো লাগে না কোনোকালেও। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়,

কখনো-কখনো তা ছাড়া উপায় থাকে না।' সে একটা সিগারেট ধরালো, পা তুলে দিলো সামনের খালি বেঞ্চির উপর। 'তার চেয়ে এসো দু'জনে গল্প করা যাক—সময়টা কাটবে ভালো।'

খুব-খুব তাড়াতাড়ি আমি মনে মনে কতকগুলো হিসেব ক'রে নিলাম। এর পরে কখন থামবে ঠিক নেই—খুব শিগ্‌গির বোধ হয় নয়। আমি যদি দড়ি টানবার কোনোরকম চেষ্টা করতে যাই—লাভের মধ্যে লোকটাকে একটু সাহায্য করা হবে, সে একটা উপলক্ষ্য পাবে তৎক্ষণাৎ আমাকে অভিভূত করবার। আপাতত ও-রকম গা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে বটে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম সে আমাকে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে, তার শরীরের প্রত্যেকটি পেশী প্রস্তুত, আমি এতটুকু ভঙ্গী করেছি কি সে লাফিয়ে পড়বে আমার উপর।

চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। ছোটো একটা ষ্টেশন পার হ'য়ে গেলো। খানিক পর সে বলতে আরম্ভ করলো:

'তুমি কথা বলছো না—মনে হচ্ছে তুমি আমার উপর রাগ করেছো। এমন সন্দেহ করি যে আমার সম্বন্ধে তোমার খুব উঁচু ধারণা নয়। সেটা দুঃখের বিষয়, কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা আমাকে ভালো ক'রে জানবার সুযোগ তো তুমি পাওনি কখনো। সেই সুযোগ তোমাকে আজ দিতে পারছি ভেবে আমি চরিতার্থ বোধ করছি। তুমি বুঝতে পারবে যে আমি সাধারণ লোক নই। আমি একজন আর্টিষ্ট। আমি গান গাইতে পারি, আমি কথা কইতে পারি, আমি ভালোবাসতে পারি।

খাতার শেষ পাতা

সুপ্রভা, তোমাকে আমি ভালবাসি। আমি সব সময় তোমাকে ভাবি, স্বপ্নে তুমি আমাকে হানা দাও। সেই স্বপ্ন কখনো সত্য হবে, এমন দুরাশা করবার সাহস হয়নি। কিন্তু আজ তাই হ'লো। ঈশ্বর প্রেমের সহায়।

'তোমার মনে এমন ধারণা হ'য়ে থাকবে যে কলকাতা থেকেই আমি তোমার পিছন-পিছন আসছি। ভুল। আমি জানতুমও না এত বড়ো আনন্দ আছে আমার কপালে। এই গাড়িতে কলকাতা ফিরছিলাম, দুটো ষ্টেশন আগে গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করতে-করতে প্রথম তোমাকে চোখে পড়ে। আর, আর্টিষ্টের মনে সংকল্প তৈরি হ'তে বেশী সময় লাগে না।

'কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গের টাকা-কড়ি আর গায়ের অলঙ্কার উপহার দিতে চেয়ে আমাকে অপমান করলে। তোমাকে দোষ দিইনে; তুমি তো আর জানো না যে আমার হাতে যদি পৃথিবীর সমস্ত সোনার খনি থাকতো, আমি সব উজোড় ক'রে তোমার পায়ে ঢেলে দিতুম।'

একটু থেমে, সে সিগারেটটা জান্‌লা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলো:

'তুমি তো আর জানো না, তোমার মূর্তি আমার দৃষ্টিকে কী-রকম মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। সুপ্রভা: আমি সৌন্দর্যের উপাসক। সুপ্রভা, কী সুন্দর তুমি তা তুমি নিজে কী ক'রে জানবে? প্রথম যেদিন তোমার উপর আমি চোখ রেখেছি, সেদিন থেকে আমি তোমার ক্রীতদাস। তুমি কি দেখতে পাও না যে আমার অন্তরের পূজা

ধূপের ধোঁয়ার মতো তোমার দিকে উঠছে? আজ সময় এসেছে, সুপ্রভা, আজ আমার সে পূজাকে সার্থক করতে দাও। তোমার এই সৌন্দর্যের যজ্ঞে পুরোহিত হবার অধিকার দাও আমাকে।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে :

'আর বাইশ মিনিট পরে গাড়ি একটা ষ্টেশনে পৌছবে। দেরী কোরো না, সুপ্রভা, কথা কও। কেননা, যদিও তোমার সঙ্গে সমস্ত রাত, সমস্ত জীবন কাটাতে পারলে আমি ধন্য হই, তবু আর বাইশ মিনিটের মধ্যেই আমি বাধ্য হবো তোমাকে ছেড়ে যেতে। হায়, নিয়তি নিষ্ঠুর।'

সে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলুম, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

তারপর আমি লীলায়িত হ'য়ে উঠলুম। কথায়, ভঙ্গীতে, লজ্জায়, ছলনায়। সত্যিকারের অন্তরঙ্গতায় প্রবেশ করতে না দিয়ে একজন স্ত্রীলোক পুরুষকে যত ভাবে প্রশ্রয় দিতে পারে, কিছুই বাকি রাখলুম না। নিজের কৃতিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম নিজেই। আর সত্যি, এখন পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি যে লোকটাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে দিতে পেরেছিলুম আমি। স্পষ্ট বোঝা গেলো, এতটা সে আশা করেনি।

এক সময় হঠাৎ সে ব'লে উঠলো, 'এ কী! আমরা কী করছি! কথা বলতে-বলতেই যে সময় ফুরিয়ে গেলো। আর যে দশ মিনিটও

নেই। আমাকে সেই স্বর্গে নিয়ে যাও, এতদিন যার ধ্যান করেছি।' আবেশে তার দু' চোখ বুজে এলো।

আমার মুখের উপর উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। আর আমার ঠোঁটের উপর—আঃ, সেই নরম মাংস! আমি একটুখানি ঠোঁট খুললুম—নরম, পিছল একটা জীবন্ত পোকা আমার দাঁতের মাঝখানে। সেটাকে গুঁড়ো ক'রে দিতে হবে, দিতেই হবে। হঠাৎ দাঁত দিয়ে আমি খুব জোরে চাপ দিলুম। অস্ফুট কোনো শব্দ হ'লো কি না হ'লো, মনে নেই। আমি চোখ বুজলুম। আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রাণ যেন সেই কঠিন চেষ্টায় মূহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলো। একটু পরে রক্তের লোনা স্বাদে আমার সমস্ত মুখ ভ'রে গেলো।

এতক্ষণ আমরা স্তব্ধ হ'য়ে শুনছিলাম। এইবার একজন জিজ্ঞেস করলে, তারপর?

—শেষ পর্যন্ত সে যখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলে, তার ঠোঁট থেকে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে। আমি বললুম, 'রুমাল দিয়ে ঠোঁটটা মুছে ফ্যালো—লোকে দেখলে কী ব'লবে।'

ততক্ষণে ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললুম, 'তোমার রুমালটা একেবারে লাল হ'য়ে গেলো যে। আমার স্যুটকেস থেকে ফর্শা রুমাল বের ক'রে দেবো একখানা?'

গাড়ির গতি ক'মে এলো। আমার দিকে অনেক রকম অর্থে ভরা এক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে—গাড়ি ভালো ক'রে থামবার আগেই সে দরজা খুলে নেমে গেলো। আমি বাথরুমে ঢুকে মুখ ধুতে প্রবৃত্ত হ'লাম।

খাতার শেষ পাতা

সেই থেকে, সুপ্রভা-দি তাঁর কথা শেষ করলেন, আমি কখনো ইণ্টার ক্লাশে ছাড়া যাতায়াত করিনে।

১৩৪০

—

রিকশাওলা

স্ত্রীটি প্রকাণ্ড মোটা, কিন্তু স্বামীটি তেমনি রোগা হওয়ায় সুবিধে হ'লো, ঠেশাঠেশি ক'রে কোনোরকমে বসতে পারলো দু'জনে। তার উপর, মা-র প্রশস্ত, মাংসল কোলে চেপে বসলো দশ বছরের ছেলেটি, আর ছ'বছরের মেয়েটার জায়গা হ'লো বাপের কোলে।

টুং-টুং বাজলো রিকশাওলার ছোট্ট ঘণ্টা। লোকটার বয়স অল্প, লম্বা জোয়ান চেহারা, চোখ বড়ো-বড়ো কালো, ঝকঝকে শাদা দাঁত। শস্তা চেক কাপড়ের যে মেরজাইটা তার গায়ে, তার আসল রং বহুদিনের ধুলো-কাদায় কালো। তবে তার ঘর্মমলিন পয়সা আনি দু'আনি রাখবার জন্যে যে পকেটটা করিয়েছিলো, সেটা ঠিক আছে।

মসৃণ, রবার-বসানো চাকায় রওনা হ'লো রিকশ।

স্ত্রী বললেন, 'এদের বেয়াদবি দেখলে! অসহ্য!'

'অসহ্য!' স্বামী তৎক্ষণাৎ রাজি হ'লেন।

এ-রকম মনে হওয়ার অবশ্য কারণ আছে। একজন, দু'জন, তিনজন রিকশাওলা এদের কিরায়া পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। একবার স্ত্রীটির দিকে তাকিয়ে, আর একবার শিশু দুটির দিকে তাকিয়ে তারা স্রেফ 'না' ব'লে বসেছে। তাজ্জব ব্যাপার! সত্যি-সত্যি আস্ত একটা দু'আনি হাতে পেয়েও ছেড়ে দেয়া…তাও এই দুর্দিনে! লোকগুলো গাধা। তাড়িখোর কুঁড়ের দল! প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হাঁ ক'রে ঘুমুবে! সাধে কি আর ওরা গরিব।

ভাবতে পারো, ওদের একজন এ-কথাও বলেছিলো যে, একটা রিকশাতে নাকি ধরবে না, দুটো নিলে ঠিক হয়। ব্যাটা বেয়াদব! লোকে যে পয়সা রোজগার ক'রে, তা কি নর্দমা দিয়ে ঢেলে দিতে? স্বামী কিন্তু মুহূর্তের জন্য টলেছিলেন, স্ত্রী যদি দস্তুরমতো রুখে না দাঁড়াতেন তাহ'লে দুটো রিকশ নিয়ে ফেলাও অসম্ভব ছিলো না। এমনি ক'রেই তো পুরুষ মানুষ অপব্যয় করে! 'পাগল! খেপেছো নাকি তুমি! যদি সারা রাস্তা হেঁটে যেতে হয় তবু দুটো রিকশ নেবো না। একটাতে ধরবেই বা না কেন? রিকশ তো দু'জনের জন্যেই—আর ঐ বাচ্চাদেরও আবার ধরবে নাকি!'

অর্ধাঙ্গিনীর এ-কথার পর অবশ্য আর কথা চলে না।

আর তার পরেই এই লম্বা জোয়ান ছোকরা রিকশ নিয়ে এগিয়ে এলো।

'কোথায় যাবেন?' হিন্দিতে বললে সে।

জবাব দিলেন স্ত্রী, 'বড়ো পার্কের কাছে।'

'চার আনা।'

'দু আনায় যাবে?'

'দূর তো অনেক, মাইজি।'

'দূর!' গালের থলথলে মাংসে ভাঁজ ফেলে মাতাজি ব'লে উঠলেন, 'অত বড়ো একটা মরদ জোয়ান তুই—এইটুকু রাস্তা দূর হ'লো! আরে এ তো হেঁটেই যাওয়া যায়—তবে···বড্ড রোদ কিনা। চল্, দশ পয়সা দেবো।'

'তিন গণ্ডা পয়সা দেবেন,' দাঁত বা'র ক'রে হেসে লোকটা বললে।

খাতার শেষ পাতা

'কেন, দশটা পয়সা কি কম !'

লোকটা এতই অসভ্য যে তবু পিড়াপিড়ী করতে লাগলো, 'না তিন আনা দেবেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, চল্। সারাদিন ভ'রে তোদের সঙ্গে দর দস্তুর করতে পারিনে তো।'

এই ব'লে স্ত্রীটি তাঁর একটি বিশাল চরণ রিকশার উপরে অর্পণ করলেন। ঘাড় ব'লে কিছু নেই তাঁর, আর মুখখানা ঠিক বেড়ালের মতো। তা হোক্, কেতা-দুরস্ত তিনিও কম নন; তাঁর হাত-ছাড়া আঁটো ব্লাউজ দু'দিকে বের ক'রে দিয়েছে থামের মতো মস্ত, বহুল-অলঙ্কৃত দুই বাহু, আর বক্ষের মেদপিণ্ড পাহাড় দুটিকেও কম কৃতিত্বের সঙ্গে প্রকাশ করছে না।

শেষ পর্যন্ত রিকশ রওনা হ'লো। আষাঢ় মাসের দুপুর, প্রচণ্ড গরম। ঋজু, প্রশস্ত রাসবিহারী এভিনিউ বেলা দুটোর তীব্র রোদে ইস্পাতের মতো উজ্জ্বল। গরম হাওয়ায় অ্যাসফল্টের গন্ধ।

জবড়জং সাজগোজের চাপে ছেলেমেয়ে দুটি প্রচুর ঘামছিলো। স্ত্রীটি বেলুনের মতো গালে ঘামের ছোটো-ছোটো নদী মাংসের ভাঁজে-ভাঁজে আর বন্দী হ'য়ে রইলো না—গড়িয়ে পড়লো বিরাট থুতনি বেয়ে, তারপর প্রায়-অদৃশ্য গলার খুঁটিতে পাউডারের শাদা রেখা ফুটিয়ে তুললো। আর শ্রীযুক্ত স্বামী অসম্ভব অসুবিধেয় টায়েটুয়ে ব'সে, ঠিক আত্মসমর্পণের ছবিটি।

'দুটো রিকশ নিলেই হ'তো,' শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন।

'বাজে বোকো না। এই ত পৌঁছে গেলাম ব'লে।' ব'লে শ্রীমতী

তাঁর ব্লাউজের ভিতর থেকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি রুমাল টেনে বের করলেন। হীরে-বসানো চুড়ি ঘষায় স্বামীর হাতের চামড়া ছ'ড়ে গেলো; উঃ বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। মুখের ঘাম মুছে শ্রীমতী হাঁক দিলেন—

'এই—জোরসে চলো! জলদি!'

সঙ্গে সঙ্গে রিকশাওলা দৌড় শুরু করলে, কিন্তু মেদ-মাংসের বিশাল ওজনে একটু পরেই তার গতি এলো স্তিমিত হ'য়ে। সূর্যটা ঠিক তার মুখের উপর, ঘামে সে এর মধ্যেই নেয়ে উঠেছে। পুরোনো রবারের জুতো ভেদ ক'রে অ্যাসফল্টের দারুণ উত্তাপ তার পা পুড়িয়ে দিচ্ছে। জুতোজোড়া সে পুরোনোই কিনেছিলো চার আনা দিয়ে, সময় তাতে অনেক ছ্যাঁদা ফুটিয়েছে।

'এই—জোরসে চলো না!' স্ত্রী আবার চিৎকার করলে।

আর একবার সে চেষ্টা করলে, কিন্তু প্রথম দমকের পরেই আবার নেতিয়ে পড়লো।

'ওর যেমন খুশি যাক না,' স্বামী বললেন।

'কুঁড়ের বাদশা! ইচ্ছে করলে কি আর জোরে যেতে না পারে—এ-সব ওদের বদমাইসি, আর-কিছু নয়।'

'দেখছো না কী গরম! আর তাছাড়া...'

'গরম!' মুখ ভেংচিয়ে শ্রীমতী ব'লে উঠলেন, 'এত যদি গরমই লাগবে, বাড়ি ব'সে হাওয়া খেলেই পারে!'

'ওদের বাড়ি কোথায়?' কিন্তু কথাটা বোধহয় স্ত্রীর কানে পৌঁছলো না। এক মাত্রা গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, 'ওদের আবার

গরম! এমন কত গরম ওদের গা-সওয়া। ওদের কাজই তো এই, আর যার যা কাজ তা করতেই হবে, রোদ-জল যা-ই হোক্।'

'তা আমাদের নিয়ে তো যাচ্ছেই।' ক্ষীণস্বরে বললেন স্বামী।

'ওঃ, তোমার মতো মেয়েলি পুরুষমানুষ দেখিনি বাপু। আমি না থাকলে তোমার কী দশা হ'তো ঈশ্বরই জানে।'

বোধ হয় জীবনে এত বড়ো সহায়ের জন্য ধন্যবাদ হিসেবেই স্বামী একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এদিকে রিকশাওলা ধুঁকছে আর চলছে। মাথা তার নোয়ানো, কাঁধের কোণ দুটো বেরিয়ে পড়া, রিকশার ছন্দে শরীর আন্দোলিত। রোদে-গ'লে-যাওয়া অ্যাসফল্টে এক-একবার তার পা পড়ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড সূর্যে সংকুচিত তার ছায়া একবার এগোচ্ছে, একবার পেছোচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বড়ো পার্ক কাছে এলো। টুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, 'কোন দিকে?'

'বাঁয়ে যাও।'

এক দৌড়ে ট্রামলাইন পার হ'য়ে সে বাঁয়ে এলো। এ-রাস্তাটি সরু, ছায়া-ভরা, ঢুকেই যে-হাওয়াটি গায়ে লাগলো তা যেন একটু ঠাণ্ডা।

'আঃ!' নিঃশ্বাস ছেড়ে স্ত্রী বললেন, 'একদিন এ-পাড়ায় একটা বাড়ি করতেই হবে—লেকের কাছাকাছি।'

'জমি অগ্নিমূল্য,' স্বামী বিষণ্ণভাবে বললেন।

'আরো দক্ষিণে নাকি সস্তা। খোঁজে থাকলে কি আর সুবিধে মত একটু জমি না পাওয়া যাবে।'

খাতার শেষ পাতা

'আর কত দূর ?' রিকশাওলা জিজ্ঞেস করলে।

'এই তো—আর কয়েক পা।'

'বড়ো-পার্ক তো কখন ছাড়িয়ে এলাম।'

'হ্যাঁঃ—বড়ো পার্কের কাছেই তো—তা নয় তো কী !'

'চার আনার কম হবে না,' বিড়বিড় ক'রে বললে লোকটা।

আরো মিনিট তিনেক পরে পৌঁছনো গেলো। সুন্দর একটি নতুন বাড়ি, দক্ষিণ-মুখো, সামনে লেক পর্যন্ত একেবারে ফাঁকা।

রিকশ নামিয়ে রেখে লোকটা একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে সে, কোমর থেকে অতিশয় মলিন গামছা খুলে হাওয়া করতে লাগলো।

প্রথমে নামলেন স্বামী, নেমে অর্ধাঙ্গিনীকে ও ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলিকে হাত ধরে নামালেন।

'এই নাও,' ব'লে শ্রীমতী দু'আনি বের করলেন।

লোকটা হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

'নাও না এটা।'

'কী! দু'আনা! এ তো একেবারে লেকের ধারে! চার আনার কম হবে না।'

'নাও এটা!' স্ত্রী আবার আদেশ করলেন, 'দুটো আরো পয়সা দিচ্ছি।'

রিকশাওলা তার নোংরা হাতটা বাড়িয়ে দিলে। অতি সন্তর্পণে ছোঁয়া বাঁচিয়ে শ্রীমতী তার মধ্যে একটি দু'আনি ফেললেন। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে ফুটপাথে।

খাতার শেষ পাতা

'কী!' চীৎকার ক'রে উঠলেন বঙ্গ-বীরাঙ্গনা, 'এত বড়ো সাহস! ভাগো হিঁয়াসে, এক পয়সা ভি নেই মিলেগা। যাও! ভাগো! কী করতে পারো দেখবো।'

ব'লে তিনি বাড়ির ভিতরে যেতে লাগলেন।

'এটা ঠিক হচ্ছে না,' স্বামী চুপি চুপি বললেন, 'তিন আনা দিয়ে দাও।'

'এক পয়সা নয়!' গ'র্জে উঠলেন সহধর্মিণী। 'ঐ দু'আনিটি তুলে নিয়ে চ'লে এসো।'

ম্রিয়মাণ স্বামী নীচু হ'য়ে ক্ষুদ্র মুদ্রাটি তুলে নিলেন। কিছুদূরে রিকশাওলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, উদ্ধত, ক্রুদ্ধ তার দৃষ্টি।

তারপর সে এগিয়ে এলো।

'কসুর মাপ কীজিয়ে, মাইজি,' নীচু গলায় সে বললে।

'কেমন এবার!' শ্রীমতীর বিজয়ী দৃষ্টি একবার স্বামীর, একবার রিকশাওলার উপরে পড়লো।

'আপনাদের কতক্ষণ দেরি হবে এখানে? যদি বলেন আমি দাঁড়াতে পারি।'

'যাওয়া-আসা সব সুদ্ধ কত নেবে?'

'দয়া ক'রে যা দেন,' লোকটার সাদা দাঁত ঝল্‌সে উঠলো।

'এক ঘণ্টা দেরি হবে।

'বহুৎ আচ্ছা।'

'বেশ তো। চলো এবার ভিতরে যাই।'

বাড়ির ভিতর ঢুকতে-ঢুকতে শ্রীমতী বললেন, 'দেখলে তো, লোকটার

কেমন চট ক'রে সুর বদলালো। যেমন কুকুর, তেমন মুগুর চা
তো। গরম-গরম দিলে তবে এ-সব লোককে সজুত রাখা যায়। এক
ঢিলে দিয়েছো কি মাথায় চড়তে চাইবে, চোখ রাঙালেই কেঁচো
ছোটলোকের নিয়মই এই। এদের চালাতে জানতে হয়!'

জয়ের গর্বে তিনি যেন আরো একটু মোটা হ'য়ে গেলেন।

চারটের পরে তাঁরা বাড়ি থেকে বেরুলেন। দু' ঘণ্টারও বে
কেটে গেছে। রিকশাওলা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তা আশা ক
যায়নি, কিন্তু ঐ তো সে—হাসতে-হাসতে টুং টুং ক'রে ঘণ্টা বাজাচ্ছে
এরা জাত-কুকুর। একখানা হাড় ছুঁড়ে দিলে কি তোমার কে
গোলাম।

আগের বারের মতোই এঁরা রিকশতে চেপে বসলেন। যেই ন
বসা, লোকটা তক্ষুনি ঘোড়ার মতো দৌড়াতে শুরু করলে।

'এই—এত জোরে না!'

'সেবারে তো জোরে যেতেই বলছিলেন, মাইজি। দেখুন না, ক
জোরে ছুটতে পারি।'

আর ঠিকই—লোকটা প্রায় ঘোড়ার মতোই ছুটলো। ঘন-ঘ
বাজলো ঘণ্টা, মোটরগাড়িগুলো প্রায় গা ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে। দে
মিনিটে তারা রাসবিহারী এভিনিউতে এসে পৌছলো।

এতক্ষণে সূর্যের তেজ একটু কমেছে। পার্কে শুরু হয়েছে ঝি-চাকর

খাতার শেষ পাতা

শিশু আর ফেরিওলার ভিড়। শাঁ ক'রে রিকশাটা ডাইনে মোড় নিলে, আর হঠাৎ হাতল দুটো প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেকলো, পিছন দিকটা নেমে এলো মাটিতে। স্ত্রী, পুরুষ আর শিশুর মাথা ঠেকলো মাটিতে পা উঠলো শূন্যে।

স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, শিশুরা কেঁদে ফেললো, আর স্বামী উঠলেন হাউ-হাউ ক'রে। গোলমালের মধ্যে শোনা গেলো কারা সব হো-হো ক'রে হেসে উঠছে। দেখতে-দেখতে ভিড় জ'মে গেলো, ট্রাফিক থমকে দাঁড়ালো, আর শোনা গেলো নানা গলার, নানা সুরের কথা:

'কী হয়েছে, মশাই? কারু চোট লেগেছে নাকি? অ্যাম্বুলেন্স ডাকবো? কী ক'রে হ'লো?' ততক্ষণে স্বামীটি উঠে দাঁড়িয়েছেন। লজ্জায় লাল হ'য়ে তিনি ছেলেমেয়েদের টেনে তুললেন, তারপর পাহাড়প্রতিমা সহধর্মিণীকে কোনোরকমে দাঁড় করালেন। ভয়ে, রাগে তিনি হাঁপাচ্ছেন। ঘর্মাক্ত মুখে তাঁর ধুলোর ছাপ, চুল গেছে খুলে, ঝকঝকে জর্জেট শাড়িটার এক কোণ ছিঁড়ে গেছে। তিনি উঠে দাঁড়াতেই কতগুলো অসভ্য ছোকরা ভিড়ের ভিতর থেকে হেসে উঠলো।

দেখা গেলো, একটু দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রিকশাওলা দাঁত বের ক'রে হাসছে।

'শালা শূয়ারকা বাচ্চা,' স্বামী হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠলেন, 'ও ইচ্ছে ক'রে ফেলে দিয়েছে। শালা, তোর সব ক'টা দাঁত আজ ভাঙবো।'

খাতার শেষ পাতা

'হ্যাঁ মশাই, দিন্ আচ্ছা ক'রে দু'ঘা বসিয়ে,' ভিড়ের একজন উঠলো।

'পুলিশে দেবো তোকে হারামজাদা, ঠেশে ড্যামেজ আদায় করা জেলে পচ্‌বি দু'বছর।' মুখ ভেংচিয়ে স্বামী চীৎকার ব লাগলেন।

'ওকে জেলে দিয়ে কোনো লাভ নেই, মশাই, সেখানে ও দিব্যি থাকবে। ক'ষে দু'ঘা দিন্, নাকটা ভেঙে দিন, কান দুটো ি ফেলুন।'

এর পরে সত্যি-সত্যি স্বামীটি ছুটে গিয়ে রিকশাওলার নাকের উ এক ঘুষি বসিয়ে দিলে। আরো অনেকেই যোগ দিলে এই বিনিপয়ঃ ভোজে। একটু পরেই লোকটা রাস্তার উপর প'ড়ে গেলো, নাক দি তার প্রচুর রক্ত গড়াচ্ছে।

'থাক, আর না,' কে একজন বললে।

'শালা-শূয়ারকা-বাচ্চার আশা করি যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

আস্তে-আস্তে ভিড় ক'মে যেতে লাগলো। 'চলো এবার,' হা ঝাড়তে-ঝাড়তে স্বামী বললে, 'একটা ট্যাক্সি নিতে হবে।'

'ট্যাক্সি!' অর্ধাঙ্গিনী মর্মভেদী আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন।'

'তোমাকে কী বিকট দেখাচ্ছে জানো না।'

'যাক, লোকটা খুব মার খেয়েছে তো! আমাদের রিকশভাড়া বেঁচে গেলো, কিন্তু ট্যাক্সিতে কত নেবে?'

স্বামী একটা ট্যাক্সি ডাকলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে স্ত্রী আর্তস্বরে বললেন 'ওঃ, কতগুলো পয়সা নষ্ট

কী বজ্জাত! কী শয়তান! আমার শাড়িটাও গেলো, এ-রকম শাড়ি আমার আর নেই—ওঃ।'

দুঃখে তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি।

এদিকে রিকশাওলা আবার উঠে তার রিকশার ডাণ্ডা ধ'রে দাঁড়িয়েছে। তার রক্ত-মাখা মুখে অদ্ভুত এক হাসি আঁকা। কোমরের গামছা দিয়ে মুখ মুছে সে একবার ঘণ্টা বাজালো, তারপর আবার ঘাড় জুতে শরীর নোয়ালে। শরীরে তার অসহ্য ব্যথা, কিন্তু মনে যে কেন তার এত ফুর্তি সে-ও জানে না।

১৩৪৫

অর্কে

মিসেস সেন বললেন, 'এই যে, এসো।' আধ ঘণ্টার মধ্যে ছ'বার বললেন।

অতিথিরা এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছে। এখনো বিবে গাছের মাথায়-মাথায় সোনালি; আকাশে ছোটো ছোটো গোলাপি ে ভেসে চলেছে মুমূর্ষু দিনের দিকে। কী সুন্দর আলিপুর এই প আশ্বিনের বেলায়।

কিন্তু মিসেস সেনের ড্রয়িংরুমে এখনই আলো জ্ব'লে উঠছে। ভূত আলো, কোথা থেকে আসছে টের পাওয়া যাচ্ছে না যেন, সমান হ পড়েছে সমস্ত হলদে দেওয়ালে আর মার্বেলের মেঝেতে। দুটো থা ভিতর দিয়ে বারান্দায় যেতে হয়, তারই ফাঁকে বসেছেন মিসেস সে পরনে তাঁর একটি কালো-আর-রুপালি-শাড়ি, খেই সম্ভ্রম হ যতবারই একজন অতিথি আসে, তিনি উঠে দাঁড়ান অভ্যর্থনা করতে।

এবার এলো ডোডো। দীর্ঘ সে, ঋজু সে, উঁচু খুর-তোলা জুতে হেলতে দুলতে এমনভাবে ঢুকলো যেন সত্যিই সে সেই মহামূল্য পাখি। তার স্বামী বুঝি ছোটোনাগপুরে জংলি চাকুরে। তার আ নাম কেউ যেন জানেই না, সবাই ডাকে ডোডো বলে।

ভারি রেশম ভাঁজে-ভাঁজে ঝলমলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস সে 'এই যে, এসো।'

খাতার শেষ পাতা

'এতদিনে! ঐ ডোডোপাখির মতোই প্রকাণ্ড শরীর থেকে ক্ষীণ, কম্পিত কণ্ঠ! 'এতদিনে আমাদের সৌমেন তাহলে বিয়ে করছে।'

'জানুয়ারির আগে নয়।'

'নববর্ষে নব হর্ষ!' ডোডো পদ্যে উছলিয়ে উঠলো, 'আর মলির মনের ভাবখানা কী?'

'স্বর্গে আছে সে।'

'Ah Love! Could thou and I with Fate conspire!' ডোডো আবৃত্তি করলে, সচেতনভাবে, সম্ভাব্য শ্রোতার আশ্রয় চারিদিক তাকিয়ে। কিন্তু হায়, অন্য সবাই ঘরের অন্যদিকে; তার আবৃত্তি দূরের কথা, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কারো খেয়াল নেই। ডোডো হতাশ হ'লো, কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে বললে, 'কোথায় সেই যুগল—' "world-losers and world-forsakers?" সে সামলাতে পারলে না, এই পদ্যাংশ সোডার মত ভস্‌ভসিয়ে উঠলো তার ভিতর থেকে। যদিও অশিক্ষিত মিসেস সেন ছাড়া আর কেউ শোনবার নেই। চেক সই করা আর দশটা কোম্পানির চিঠিপত্র পড়া—লেখাপড়ার সঙ্গে এই তো তাঁর সম্পর্ক। কী ভয়ানক, ডোডো ভাবলে। মিসেস সেনের তুলনায় নিজেকে তার এত উঁচু মনে হ'লো যে, ঐ স্ত্রীলোকের অগাধ অনুপার্জিত অর্থ সম্বন্ধে ঈর্ষার ভাবটা অতি সহজেই চাপা পড়লো। জীবনে কখনো একটা কবিতা পড়েনি—কী ভয়ানক!

'"Losers" বিশেষ নয়,' মিসেস সেন বললেন। 'সৌমেন ব্যাঙ্কে বেশ ভালো কাজ করছে, শিগগিরই তার ছ'শো টাকা মাইনে হবে। আর মলির নিজেরও—যাক, ওরা বিয়ে করছে এটা মস্ত সুখের কথা।'

খাতার শেষ পাতা

'কোথায় ওরা ?'

'ওঃ, ওরা তো সবখানেই আছে। মলি আমাদের সব উৎসবের প্রাণ।'

'রণজিৎ আছে কেমন ?' ডোডো অন্য কথা পাড়লো।

'চমৎকার আছে।' তাঁর তেইশ বছরের ছেলের উল্লেখেই মিসেস সেন যেন বয়সে সত্যি-সত্যি ছোটো হ'য়ে গেলেন, তাঁর অপূর্ব প্রশান্ত মুখ লঘু হাসির লীলায় ভেঙে গেলো। 'তবে কিনা ওর মা-কে আর আগের মতো ভালোবাসে না।'

'বাসে না ?' এর পরে কী বলবে ডোডো ভেবে পেলো না। যাক, ঐ তো বীণা আর ব্রজ এসে পড়েছে।

মিসেস সেনও নব আগন্তুকদের লক্ষ্য করেছিলেন, ডোডোর সঙ্গে কথাটা শেষ করবার ভাবে বললেন, 'জানো তো, আমাদের এখানে আজ গান হচ্ছে।'

'ও, শীলার ফ্রেঞ্চ গান—'

মিসেস সেন হাসলেন। 'না অন্য জিনিশ। একেবারেই অন্য জিনিশ। বিশেষ-কিছু। রণজিৎ মিরজা সাহেবকে ঠিক করেছে, তিনি গাইবেন।' খবরটা ব'লে মিসেস সেন সগর্ব বিজয়ী ভঙ্গিতে তাকালেন।

'মিরজা··· ?'

বীণা আর ব্রজ ততক্ষণে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এইমাত্র ডোডোকে মিরজা সাহেবের কথা বলছিলাম,' মিসেস সেন তাদের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বললেন।

২

আটটার মধ্যে মিসেস সেনের বিশাল ড্রয়িংরুম ভ'রে গেলো। প্রায় একশো অভ্যাগত। এক হাজার, এক কোণে একলা ব'সে-ব'সে মৃন্ময়ের মনে হ'লো, দশ হাজার। হাজারে-হাজারে কাতারে কাতারে এসেছে এরা। মানুষের সমুদ্র। শাড়ি ঝলসাচ্ছে, কথা চলেছে, সরু নীল সিগারেটের ধোঁয়া ভেসে চলেছে সোনালি সীলিঙের দিকে—মৃন্ময় মনে-মনে হেসে ভাবলে, রসেটির ব্লেসেড ড্যামোজেলের সেই স্বর্গগামী আত্মাগুলির মত। এই অদ্ভুত উপমাটা নিয়ে মনে-মনে সে একটু খেলা করছে, এমন সময় ডোডোর ঝকঝকে মস্ত মূর্তি দেখা দিলো তার সামনে।

মৃন্ময়ের ঠোঁটে হাসির আভাস লক্ষ্য ক'রে, 'ঠাট্টাটা কী জানতে পারি ?' ডোডো জিজ্ঞেস করলে।

'ঠাট্টাটা গোপন।'

'যত গোপন ততই মিষ্টি।' কাকাতুয়ার মতো চীৎকার ক'রে হেসে উঠলো ডোডো।

'তাছাড়া, অর্থহীন।'

'অর্থহীন ঠাট্টাই আমি সবচেয়ে ভালবাসি।' 'বেশ—' বলে মৃন্ময় থামলো। কারো সম্বন্ধে একটা গল্প বানাতে হবে, নয়তো ডোডো নড়বে না। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বাঁচালেন—ঐ তো সুধীন আসছে। দেখা গেলো সুধীনের ঈষৎ বাঁকা শরীর, সাপের মতো চোখ, আর কত লোকের সম্বন্ধে কত মজার গল্প যে সে জানে তার অন্ত নেই।

'এতক্ষণে!' নাটকীয় ধরণে ব'লে উঠলো সুধীন। 'ডোডো, তোমার পিছন-পিছন ধাওয়া করা আর আস্ত একটা ক্রস্-কন্‌ট্রি রেস দৌড়োনো একই কথা। এই যে, মৃন্ময়।'

সুধীন মাথা নেড়ে হাসলো। এটা তার দয়া বলতে হবে, কেননা মৃন্ময় 'তাদের একজন' নয়, এখনো পুরোপুরি নয়। এখানে মৃন্ময় এসে পড়েছে দৈবাৎ, তার এখানে অধিকার নেই। সে-ই না শশাঙ্ক বোসের এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলো—হ্যাঁ, পালিয়েছিলোই বলতে হবে, মীরাকে বিয়ে করবার কোনো অধিকারই যে নেই ওর। বেচারা, পরম করুণায় সুধীন ভাবলে, বিয়ে ক'রে বৌয়ের আঁচল ধ'রে হাঁটু ভেঙে সোসাইটিতে ঢোকা!

'কেমন আছে তোমার অতুলনীয়া স্ত্রী?' সাপের মতো ঝকঝকে চোখে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে সুধীন বললে।

'অতুলনীয়াই আছে সে।'

'ওকে না এইমাত্র দেখলুম বীণার সঙ্গে,' ডোডো ব'লে উঠলো। 'নোট মেলাচ্ছে আর কি দুজনে। যা মনে হয় বিয়ে তা নয় কেমন না?' মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ডোডো চটুলভাবে হাসলো। 'একদিন আমাকে সব বলতে হবে কিন্তু।'

'কী বলতে হবে?'

সুধীন তার লম্বা ঘাড় বাড়িয়ে কোনো-একটা আশ্চর্য রসিকতা করতে যাচ্ছিলো নিশ্চয়ই, এমন সময় বীণা সেখানে এসে উপস্থিত।

'কী সংবাদ, নারী?' বললে সুধীন।

বীণা খবর এনেছে বটে। মিরজা সাহেব এসেছেন, এই এলেন ব'লে উপরে।

সুধীন কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে—তার মতো নিখুঁত shrug দলের মধ্যে আর কারুরই নয়।

—'মিসেস সেনের হাবাগোবা লক্ষপতিদের একজন বুঝি?'

ডোডো এত বেশি জোরে হেসে উঠলো যে, তার পিছনে যে তিনজন বুড়ো ভদ্রলোক ব'সে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট নিয়ে আলাপ করছিলেন তাঁরা চমকে ফিরে তাকালেন।

'ওঃ, মোটে পঞ্চাশ টাকা!' তীক্ষ্ণস্বরে ব'লে উঠলো ডোডো। 'তবলচি সুদ্ধু!'

সুধীন চোখ বড়ো ক'রে বললে: 'তাহ'লে এবার উচ্চ সঙ্গীতের পাল্লায় পড়া গেছে।'

'প্রতিভা! অসাধারণ প্রতিভা! সোজা স্বর্গে চ'লে যাবে।' হাসির চাপে ডোডো কঁকিয়ে উঠলো, তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লো হাসির চীৎকারে।

'কী নাম বললে?' মৃন্ময় বীণাকে জিজ্ঞেস করলে, মিরজাসাহেব?'

কিন্তু মৃন্ময়ের ক্ষীণ প্রশ্নটা ডোডোর হাসির ধাক্কায় উড়েই গেলো।

'অসাধারণ প্রতিভা। এ হ'লো গিয়ে বিশুদ্ধ সঙ্গীত। "I pant for the music which is divine"।' ডোডোর মগজে পলগ্রেভ যেন টগবগ ক'রে ফুটছে।

'ঐ তো,' ব'লে উঠলো বীণা। সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই ফিরে তাকালো। ছোট্ট একটি মানুষকে নিয়ে আসছে—আর-কেউ নয়, স্বয়ং,

রণজিৎ। ছোট্ট, অল্প দাড়ি আছে, পরনে পাজামা, আর একটা খয়েরি রঙের কোট। পিছনে আসছে আর একটি টাক-পড়া লোক, আর যে উর্দি-আঁটা চাকরটা তানপুরা আর তবলা ব'য়ে আনছে, তার মুখে অতি উদার সহনশীলতার ব্যঞ্জনা।

'প্রতিভা!' ডোডো চুপি-চুপি এমনভাবে বললে, যেন ওটা অসম্ভব একটা হাসির কথা।

ডোডোর কাঁধে টোকা দিয়ে বললে সুধীন, লক্ষ্ণৌয়ে এক ওস্তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো—'

'এক্ষুনি আরম্ভ হবে নাকি?' বীণা একটু যেন ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলে। সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, এই 'বিশুদ্ধ সঙ্গীত' শুনে সে মুগ্ধ হবেই। কিন্তু মুগ্ধ হবার সময় যতই কাছে আসছে ততই তার বোধ হচ্ছে অপারেশনের সকালবেলার মতো।

কিন্তু তার প্রশ্ন কেউ শোনেনি। সেই ঝলোমলো ঘরের ভিতর দিয়ে আসছে ওস্তাদ—ডোডো আর সুধীনের চোখ সেইদিকে। ঘরের মাঝখানে সবুজ আর সোনালি রঙের খাঁটি কাশ্মীরি গালিচায় দয়াশীল ভৃত্য রাখলো যন্ত্রগুলো। মিসেস সেন উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন—এই বিশেষ অনুগ্রহ সেদিনের মতো প্রতিভার জন্যেই মজুত রাখা হয়েছিলো। ওস্তাদজী মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন।

'এক্ষুনি আরম্ভ হবে নাকি?' বীণা আবার জিজ্ঞেস করলে। তার দুশ্চিন্তা অসহ্য হ'য়ে উঠছিলো। সে ফিরে তাকালো মৃন্ময়ের দিকে, কিন্তু মৃন্ময় সেখানে নেই। কিছু না-ব'লে কখন যে চ'লে গেছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

৩

এঁকে-বেঁকে, ঘুরে-ফিরে, বেহাগের রূপ ফুটে উঠছে। যেন কোনো আশ্চর্য মধ্যরাত্রির ফুল। পাপড়ির পর পাপড়ি, উঠছে, পড়ছে, আবার ফুলে উঠছে, শব্দের জটিল বিচিত্র নক্‌শায়। তানপুরার গুঞ্জন, তবলার স্পন্দন; মিরজা সাহেবের রেখা-আঁকা মুখ, তামাটে রঙের পুরু নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, জোলো-জোলো চোখ দুটো যেন ফাঁসির মড়ার মত বেরিয়ে আসতে চাইছে। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অপরূপ—শব্দের এই উদ্দাম অবিশ্রান্ত ঝরণা।

'হিমোফিলিয়ার মতো' সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে সুধীন মন্তব্য করলে, 'কিছুতেই থামবে না।'

'না কি প্রেমের মতো?' জবাব দিলে ডোডো। 'বাসি হ'য়ে যায়, প'চে যায়, তবু থামে না।'

শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠলো সে, তার কানের প্রকাণ্ড নীল পাথর সুধীনের কাঁধে আঁচড় কাটলে।

'সুন্দর', বীণা মনে-মনে বললে। 'কী সুন্দর!' সে প্রাণপণ চেষ্টা করলো মুগ্ধ হ'তে, মূর্চ্ছিত হ'য়ে যেতে। কিন্তু, যতই চেষ্টা করুক, একটি চিঠির কথা না-ভেবে সে কিছুতেই পারছিলো না। যে-চিঠি কাল

সকালে তার মাকে লিখবে। এই সব কথা। মিরজা সাহেবের কথা, বিশেষ ক'রে। মাগো, কী অদ্ভুত গান···

'অদ্ভুত!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে একটি মেয়ে। মুখখানা তার হুবহু দোকানের জানলায় সাজানো পুতুলের মতো। নিখুঁত ও অত্যন্ত দামি স্যুট পরা একটী যুবকের দিকে সে ফিরে তাকালো। 'অদ্ভুত—তাই নয়?'

'অত্যন্ত অদ্ভুত,' অতি সহজেই যুবকটি সায় দিলে।

'বেলার খবর কী বলতো? এখনো দারজিলিঙে ফগ্ খাচ্ছে?'

যুবকটির মুখ লাল হ'য়ে উঠলো।

'আমার মনে হয় ওর অন্যান্য জিনিস বেশি ক'রে খাওয়া উচিত। যেমন, প্রোটিন। যেমন ফ্যাট। সত্যি বড়ো রোগা। জানো তো, ঈশ্বরের আর মানুষের চোখে স্ত্রীলোকের এক সার্থকতা হচ্ছে···'

যুবক মুখচোরাভাবে হেসে উঠলো।

'চায়ের শেয়ারে আর-কিছু নেই,' তিনজন বুড়ো ভদ্রলোকের একজন বললেন, 'কিছুই নেই।'

খাতার শেষ পাতা

'সত্যি বলতে, কটন্-মিল্ ছাড়া আর-কিছুই নেই আজকাল। উঃ, টাকা জিনিসটা কী ঝামেলা!'

'টাকা একটা উৎপাত'। বললেন তৃতীয় ভদ্রলোক। তিনি রোগা, মাথায় অনেক সাদা-হ'য়ে-আসা চুল। 'কিন্তু লোকটা বেশ গাইছে। ভালো ক'রে শুনতে পেলে হ'তো।' পাইপে টান দিয়ে তিনি একটু চুপ ক'রে রইলেন। 'অসম্ভব! বাঁদরের মতো চেঁচাচ্ছে সবাই।'

'বিশেষ-কিছু নাকি?' টাকা নিয়ে বিব্রত ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'কিম্বা সিনেমা,' ব'লে উঠলেন প্রথম ভদ্রলোক। 'সিনেমাতে বেশ কিছু টাকা ফেললে অল্প সময়ের মধ্যেই···এই দেখুন না···'

খুব পাতলা গোঁফওয়ালা এক উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির যুবতী বললে: 'ফুটবল হচ্ছে যুদ্ধের সবচেয়ে ভালো বদ্‌লি।' কথাটা সে এক বইতে পেয়েছিলো, কিন্তু সে-কথাটা সে অতি নির্ভুলভাবেই ভুলে গিয়েছিলো।

'সত্যি তাই মনে হয় আপনার?' অত্যন্ত গম্ভীর চেহারার এক যুবক তার চশমা-পরা দৃষ্টি মেয়েটির কিশোর গোঁফের উপর রাখলো। 'এদিকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এদিকে অতিরিক্ত পণ্যোৎপাদন। এদিকে হিটলার আর মুসোলিনির দল। এদিকে—'

'এদিকে একটু গান শুনলে কেমন হয়?' খুব সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে বললে। 'সত্যি অসাধারণ।'

একটা মোহ, একটা যাদু, ডাইনিদের অলৌকিক মন্ত্র। মৃণ্ময় কার্পেটের উপর আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বসে, তার নেয়ানো মাথা গানের তালে-তালে নড়ছে, তার চোখ আধো বোজা। অসহ্য, অসহ্য। যন্ত্রণার মতো।

ডোডোর কাঁধে টোকা দিয়ে সুধীন বললে: 'মৃন্ময়কে ছাখো! মোক্ষলাভ করেছে। স্বর্গে বদ্লি হয়েছে। কেমন মাথা ঝাঁকছে, ছাখো! আচ্ছা ডোডা, তোমার মেয়ে কোথায়?'

'নামকুমের কন্‌ভেণ্টে পড়ছে। আছে বাপের জিম্মায়। Out of harm's way,' শেষের কথাটা ব'লে ডোডো দাঁত বের ক'রে হাসলো।

'এতদিনে প্রায় মনোহারিণী অরুণী হ'য়ে উঠেছে—কী বলো?'

'ঠিক কথা, সুধীন, তুমি ওকে বিয়ে করবে? আমার আপত্তি নেই, তাছাড়া...'

'শাশুড়ির খাতিরে...' ব'লে সুধান চোখের পাতা মিটমিট ক'রে নাড়লো।

এখন একটা তারা। ফুলের মতো তারা ফুটছে। ফুলের মতো, তার বোজা চোখের সামনে। নীল আকাশ থেকে। শূন্য থেকে। কিছু-না থেকে। সীমাহীন সময়হীন শূন্য একটি ফুল হ'য়ে ফুটেছে, একটি তারা। 'তিনটি শব্দ থেকে আমি সৃষ্টি করি চারটি শব্দ নয়, একটি তারা।' সাতটি শব্দ থেকে আমি সৃষ্টি করি বাসনার এক বিশ্ব। আর কী প্রচণ্ড বাসনা! বেহাগ শুনলেই মৃন্ময়ের যেন কান্না পায়। গানের বন্যায় সে ভাসছে, সে দুলছে, এখন আর তার চেতনা নেই। পারিপার্শ্বিক তো মুছে গেছেই, এখন আর গানটাও যেন কান দিয়ে শুনছে না…শুধু তার বুকের মধ্যে কী-যেন ঠেলে উঠছে, ভয়ঙ্কর, অসম্বরণীয় বেগে। আর তার বোজা চোখের মধ্যে সেই একটি তারা ক্রমশই বড়ো হ'য়ে উঠছে, আরো বড়ো, তারপর তা একটা সূর্য হ'য়ে উঠলো।

'ঠোঁট দুটো ছাখো,' বললে ডোডো। 'অতিরিক্ত তাম্বুল চর্বণ।'

'কিন্তু অঙ্গ-ভঙ্গি দেখছো!' সুধীন গম্ভীরভাবে বললে।

'এই শেষের মুখভঙ্গিটা দেখলে! যেন ওর এক গালে কেউ চড় মেরেছে, আর এক গাল পেতে দেবে কিনা তাই ভাবছে।'

উচ্চ,—উচ্চস্বরে হেসে উঠলো দু'জনে।

'উশ্—গানটা একটু যদি শুনতে পেতুম!' রোগা চেহারার বুড়ো ভদ্রলোক পাইপের গোড়াটা চিবোতে-চিবোতে আর্তস্বরে বললেন, 'বেবুনের দলের মতো কিচিরমিচির'...

'আশ্চর্য্য!' বীণা ভাবলে, 'আশ্চর্য্য!' সে সমস্ত মন দিয়া শুনলো, মনোনিবেশের চেষ্টায় প্রায় পাগল হ'য়ে গেলো। কিন্তু চিঠির ভূত কিছুতেই তাড়ানো যাবে না। 'মা-মণি, কাল সন্ধেবেলাটা কী চমৎকার কাটলো! এমন গান শুনলুম...' মনে মনে প্রায় অর্ধেকটা চিঠি লেখা হ'য়ে গেলো। তারপর একটা ঘা খেয়ে ফিরে এলো সেই পাঁশুটে তানপুরাধারীর কাছে, হাত নেড়ে মুখ ভেংচিয়ে চেঁচাচ্ছে। অদ্ভুত, আশ্চর্য্য! এমন গান কি সে জীবনে কখনো শুনেছে? 'জানো মা, নিরঞ্জা সাহেব সত্যিকার প্রতিভাবান...' নাঃ, অসম্ভব।

বাইরে বারান্দায়, রাত্রির হাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে লাগলো মৃন্ময়ের গালে। সে পালিয়ে এসেছে, এখানে—এতক্ষণে সে একা। প্রতিধ্বনি,

প্রতিধ্বনি···সময়ের সুরঙ্গ বেয়ে কোথায় চ'লে গেলো, তারা-ভরা আকাশ পেরিয়ে কোথায় চ'লে গেলো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় দীর্ঘ,—দীর্ঘ কয়েকটা নিশ্বাস নিলে সে। ঘরের মধ্যে গোলমাল কেবলই বেড়ে চলেছে। কারা সব গায়ককে বাহবা জানাচ্ছে। এত গোলমাল ছাপিয়ে ডোডোর তীক্ষ্ণ কাঁকাতুয়া-কণ্ঠ পৌঁছলো এসে তার কানে। এখন তো ডিনার। কিন্তু ডিনারে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না। তাকে যেতে হবে, পালিয়েই চ'লে যেতে হবে। মীরা বোধহয় কিছু মনে করবে না।

'মৃন্ময়কে লক্ষ্য করেছিলে?' ডোডো হাসলো। 'সত্যি-সত্যি কাঁদছিলো!'

"Music hath its charms," বললে সুধীর, '···to make asses of men.' তারপর, ভিড়ে ভরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে নামতে-নামতে: 'তুমিই বলো, ডোডো, এই জরজেট শাড়িগুলো কি বড্ড বেশি এগ্‌জিবিশনিস্‌টিক নয়?'

১৩৪৩

সোম

আমরা যখন ল ক্লাশে পড়ি, সুনীতনাথ ছিলো আমাদের সহপাঠী। পরবর্তী জীবনে সহপাঠীদের স্মৃতি ক্রমশই ফিকে হ'য়ে আসতে থাকে, অনেককে হয়তো আমরা ভুলেই যাই। কিন্তু সুনীতনাথকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। তার কারণ অবিশ্যি এ নয় যে তার মধ্যে কোনো-রকম কিছু অসাধারণত্ব ছিলো। কিন্তু নিছক সাধারণ যে কত ভালো হ'তে পারে, সে ছিলো তারই উদাহরণ। আমাদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা ছিলো কেবল অপরিমিত ভালোমানুষির জোরে। ক্লাশের আড়াইশো ছেলের প্রায় সকলের সঙ্গেই তার ভাব, যদিও আমাদের দলের সঙ্গেই তার বিশেষ রকম সংযোগ। এ-সংযোগ নিতান্তই অকারণ বললে বেশি বলা হয় না। কেননা, বলাই বাহুল্য, আমাদের এই দলটি ছিলো রীতিমতো নটরিয়স। আইনের প্রবীণ ছাত্রদল অনাচারের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু আমরা ইচ্ছে ক'রেই মাত্রা ছাড়িয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে-ছিলুম, যেখান থেকে ইচ্ছে করলেও আর ফেরা যায় না। একবার একটা খ্যাতি হ'য়ে গেলে চেষ্টা ক'রেও সেই অনুসারে চলতে-ফিরতে হয়। সুতরাং আমরা যখন বোহিমিয়ানিজম্-এর উচ্চ শিখরে ব'সে কলেজ স্ট্রীটকে ল্যাটিন কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করবার স্বপ্নে মশগুল, তখন অতিশয় ধীর, সুস্থির ও ঠাণ্ডা মেজাজের সুনীতনাথ আমাদের সঙ্গে এসে ভিড়লো। যেন একদল উৎকেন্দ্রিক অত্যাচারী ধূমকেতুর মধ্যে একটি শান্ত, অভ্রান্ত-নিয়মিত চন্দ্রের উদয় হ'লো। মনে-মনে আমরা নাক

শিঁটকোলুম অনেকেই, কিন্তু মুখে বাধ্য হলুম অভ্যর্থনা করতে; কেননা আমাদের শূন্য-পকেটের ক্রনিক রোগের মধ্যে সুনীতনাথ নিয়ে এলো ভরা পকেটের টনিক।

সুনীতনাথ সাতপাশার চৌধুরী-নন্দন। সাতপাশার চৌধুরীদের বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে লোকে বলে যে আজকাল নাকি আর কিছুই নেই; কিন্তু নেই-নেই ক'রেও যা আছে, তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পেলে আমি তো মনে করতুম জীবনটা ভালোই কাটলো। সুনীতনাথের বাপ-জ্যাঠা কেউ ইংরিজী লেখাপড়া শেখেনি; তাদের বংশে প্রথম বি.-এ. পাশ করে তার দাদা পার্বতিনাথ; আর তার পরেই সুনীত একেবারে এম্. এ.-র বেড়া ডিঙিয়ে আইন কেলাশের চৌরাস্তায় উপস্থিত। কথাবার্তায় বুঝতুম, এই চৌরাস্তা থেকে আবার সাতপাশার পৈতৃক প্রাসাদে ফিরে যাবার ইচ্ছে তার নেই; কলকাতায় থেকে ওকালতি করবে এবং সম্ভব হ'লে কংগ্রেসী রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে খবরের কাগজের স্তম্ভশিখর পর্যন্ত পৌছবে, এই তার ইচ্ছা। এ-ইচ্ছায় বাড়ির লোকের আপত্তি তো নেই-ই; উপরন্তু সুনীতনাথের খ্যাতির রাস্তা পালিশ ক'রে দেবার জন্য তাঁরা এমন অকৃপণভাবে টাকা ঢালছিলেন যে, তারই ছিটেফোঁটায় আমরা প্রলেটারিয়েটকুল পানে ভোজনে ও নানাবিধ আমোদে উল্লসিত হ'তে থাকলুম।

সুনীতনাথের চেহারা ছিলো ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। থেলোথোলে গোল-গাল নধর চিক্কণ কান্তি, চোখে পাতলা সোনার চশমা গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে, গায়ে সর্বদা সিল্কের জামা, পায়ে চকচকে বিলিতি পেটেন্ট, চামড়ার ফরমায়েশি জুতো, মুখে একটি প্রশান্ত ও অমায়িক

হাসি লেগেই আছে। আমরা কয়েকজন ছিলুম উপবাসী ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, আমাদের চেহারার ভাবটা ছিলো ব্রুটসের মত ক্ষীণ ও ক্ষুধিত, আর সেই আমাদের মধ্যে সুনীতনাথ যেন একটি মূর্তিমান অসঙ্গতি। দু'হাতে সে মূল্যবান সিগারেট বিলোচ্ছে, এবং সন্ধ্যার পর যেটা বিলোচ্ছে সেটা সিগারেটের চেয়েও ঢের বেশি মূল্যবান। অন্য-কোনো বিষয়ে না হোক, অন্তত শ্যাম্পেন-পান সম্বন্ধে সে-সময়ে আমরা ল্যাটিন কোয়ার্টারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছিলুম, সেটা মানতেই হবে। ঐ ফরাসি পানীয়ের প্রতি সুনীতের ছিলো রাজোচিত দুর্বলতা। অন্যান্য পানীয়ের প্রতি একেবারেই ছিলো না, সেটা বললে ভুল বলা হবে। ইউরোপীয় মদিরা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়া ছিলো তার জীবনের একটি অন্যতম উচ্চাভিলাষ। সে থাকতো বৌবাজারের মোড়ে এক দিশি হোটেলে সুইট নিয়ে; সেখানে তার প্রসাদে কাচের ও পাথরের লম্বা, চ্যাপ্টা, সরু ও গোল ভাণ্ডের লাল কমলা সবুজ সোনালি ইত্যাদি নানা রঙের নানা স্বাদের যত পানীয় আমাদের কণ্ঠনালী দিয়ে অক্লেশে নেমে গেছে, উত্তর-জীবনে তাদের চেহারাও আর চোখে দেখবো না—সেটা তখনই জানতুম।

সুনীতনাথ বলতো যে এটা তাদের একটা ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন। তার বাপ করালীনাথ যখন নাবালক, তখন থেকেই তিনি স্বীয় পিতাকে লুকিয়ে নানারকম পান-পরীক্ষা আরম্ভ করেন। গল্প আছে যে, শূন্য বোতলগুলো তাঁর ঘরের জানলা দিয়ে একটা পুকুরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে-ফেলে তিনি পুকুরটাকে ভরিয়েই ফেলেছিলেন; এখন সেখানে তাঁর শখের ফুলের বাগান। সুনীতনাথ অবশ্য সে-পুকুর চোখে ছাখেনি,

লোকের মুখে গল্প শুনেছে। তা এটা সম্ভবত গল্পই। তবে সুনীতনাথের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে যতই সে চেষ্টা করুক, এ বিষয়ে পৈতৃক আদর্শে পৌঁছুতে এখনো তার ঢের দেরি।

যাই হোক, সুনীতনাথের রাজকীয় আতিথেয়তার উত্তাপে আমাদের দিন তো বেশ কাটছে, এমন সময় একদিন খবর এলো তার ছোট বোনের বিবাহ। মেহেরপুরের বড়ো ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছিলো অনেকদিন ধ'রে, এবার অগ্রাণের এক শুভদিনে শুভলগ্ন ঠিক হয়েছে। সুনীতনাথ আমাদের ক'জনকে বললে—যেতে হবে বিয়েতে। কোথায়, সাতপাশা! সুনীতনাথ বললে—চলো না, কয়েক ঘণ্টারই তো ব্যাপার। আমাদের বাড়িটাও দেখা হ'য়ে যাবে সেই সঙ্গে।

দুই বড়ো ঘরে বিবাহ, জাঁকজমক ধুমধাম অপব্যয় অতি রোমহর্ষক-ভাবেই হবে; সেই সেকেলে বড়োমানুষি আবহাওয়ায় আমাদের মডার্ন প্রলেটারিয়েট আত্মা মুহূর্তে ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠবে নিশ্চয়ই। তবু সুনীতনাথের কথায় আমরা রাজি হ'য়ে গেলুম—সত্যি বলতে, তাকে 'না' বলা অসম্ভব ছিলো। ভাগ্যক্রমে বিয়ের তারিখটা পড়েছিলো রবিবার; ঠিক হ'লো বিকেলের দিকে গিয়ে রাতটা সেখানে কাটিয়ে আবার ভোরের ট্রেনেই ফিরে আসবো কলকাতা। সুনীতনাথ অবশ্য একমাস আগে থেকেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো; এই সে দেশে যাচ্ছে, এই আসছে, তাদের রেবতী গোমস্তা সওদার ফিরিস্তি নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটেছে, সব জিনিসই মেজবাবুর পছন্দমতো হওয়া চাই।

বিয়ের দিন সকালে সুনীত কলকাতা এলো আমাদের নিয়ে যেতে। সবসুদ্ধ আমরা আটজন যাচ্ছি। দুপুরে খাওয়ার পরে যথাসাধ্য

পরিপাটিরকম সাজগোজ ক'রে প্রস্তুত হওয়া গেলো। সঙ্গে কোনো জিনিস যাচ্ছে না, কাল সকালেই ফিরবো!

—ছাখো, কাল সকালেই আমাদের ছেড়ে দেবে কিন্তু, রওনা হবার আগের মুহূর্তে আমি আরো একবার বললুম।

সুনীত বললে—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সেজন্য ভেবো না।

ছুটো ট্যাক্সি আমাদের নিয়ে গেলো হাওড়া ষ্টেশনে। বি-এন্-আর-এ একুশ মাইল গেলেই সাতপাশা ষ্টেশন। ষ্টেশনটি এতই ছোটো যে দিনে-রাত্রে যদি পঞ্চাশখানা গাড়ি ও রাস্তা-দিয়ে আসা-যাওয়া করে, তার মধ্যে পাঁচখানাও হয়তো দাঁড়ায় না সেখানে, অনেক লোকাল ট্রেনও অপ্রত্যাশিত ঔদ্ধত্যে সাতপাশাকে পাশ কাটিয়ে হুশ্ হুশ্ ক'রে চ'লে যায়। আমরা ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছুতে-পৌঁছুতেই একখানা লোকাল ট্রেন উদাসীনভাবে প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে গেলো,—আমরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আধ ঘণ্টা পরে সাক্ষাৎ খড়গপুর প্যাসেঞ্জার, তিনি সাত-পাশাতে দাঁড়ান না। তারও পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আর একখানা গাড়ি আছে, সেটাতে আমাদের যেতে হবে।

প্রদোষ বললে—যাত্রার আরম্ভটা ভালো ঠেকছে না, সুনীত।

অমিয় বললে—ব'য়ে গেছে এতক্ষণ ষ্টেশনে ব'সে থাকতে! আমি চললুম ফিরে।

উমাপতি বললে—আমিও। বেজায় ঘুম পাচ্ছে। খেয়ে-দেয়েই বোঁ ছুট—বাব্বাঃ!

তক্ষুনি ওরা সব অ্যাবাউট-টার্ন করে আর কি। সুনীতনাথ একে বোঝায়, ওকে সাধে, হাঁশফাঁশ করতে-করতে এদিক-ওদিক ঘুরতে-

ঘুরতে ওর কপালে ঘাম দেখা দিলে। ওর পক্ষ নিয়ে আমি ছোটোখাটো একটি বক্তৃতা দিলুম। তার সারাংশ এই যে যাওয়া যখন আমরা ঠিক করেছি, এবং রেল কোম্পানিকে হুকুম করলেই একখানা স্পেশাল গাড়ি যখন পাবো না, তখন এই সময়টুকু ভদ্রজনসুলভ ধৈর্য দেখিয়ে অপেক্ষা করাই ভালো।

চা পান সিগারেট খেয়ে, হুইলরের ষ্টলে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে, ব'সে, পায়চারি ক'রে, খিস্তি গল্প ক'রে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট সময় কাটিয়ে দিতে আমাদের বেশি কষ্ট হ'লো না। ততক্ষণে বেলা প্রায় চারটে। গাড়িতে উঠে বসলুম, গাড়িও ছাড়লো, কিন্তু আমরা যতই ভাবছি এইবার গাড়ি ফুলস্পীড দেবে, ততই গাড়ি আরো বেশি টিক্‌স্-টিক্‌স্ করে—এমনি ক'রে দেখি রামরাজাতলা এসে পড়লো। বেশি কিছু বলবো না; তবে এই আধুনিক বাষ্পীয় যান আমাদের একুশ মাইল রাস্তা পার করতে ঠিক দু'ঘণ্টা বারো মিনিট নিয়েছিলো। সাতপাশায় পৌঁছুতে-পৌঁছুতে সূর্য প্রায় অস্ত গেলো।

এই গাড়িবিভ্রাটের জন্য সুনীতনাথই যেন দায়ী এইভাবে সে সমস্ত রাস্তা বারবার বলতে লাগলো—বড়ো কষ্ট হ'লো ভাই তোমাদের, বড়ো কষ্ট হ'লো। আমরা যতই তাকে বলি যে এটা কষ্ট কিছুই নয়, বরং ফূর্তি, সে মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে বলে—কিছু মনে কোরো না, ঐ প্রথম গাড়িটা পেলেই—

উমাপতি ব'লে উঠলো: যাক্‌গে এসে তো পৌঁছুলাম। বাড়ি তোমাদের কত দূরে হে?

—ঐ তো, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুনীতনাথ বললে, ঐ তো গাছের আড়ালে আবছা দেখা যাচ্ছে।

২

সমতল, সোনালি ধানক্ষেতের মধ্যে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। টিম
করছে ছোট্ট ষ্টেশন; নিকেলের চশমা-পরা রোগামত একটি ে
এগিয়ে এসে যথেষ্ট সবিনয়ে বললে—এই যে মেজবাবু, আপনার
বন্ধুরা বুঝি?

বুঝলাম সাতপাশা ষ্টেশনের ইনিই একাধিপতি। ক'দিন
লোকজনের আসা-যাওয়া হচ্ছে, মাষ্টারবাবুর পক্ষে সেটা বিশেষ গৌ
বিষয়।

—আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে আপনাদের পেলুম। ত
চারদিন থাকছেন তো?

—এঁরা কাল সকালেই ফিরে যাবেন, বললে সুনীতনাথ।

—কালই? তা এখানে মন টিকবেই বা কেন? ঠিকই তো,
তো। চৌধুরীরা আছেন ব'লেই তবু যা একটু গরগরম। মাঝে-
মানুষের মুখ দেখতে পাই।

কথা বলতে-বলতে মাষ্টারবাবু আমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন।
মাটির পথ দিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে আমরা চলেছি। এক ফাঁকে
জিজ্ঞেস করলুম—আপনিও আমাদের সঙ্গে চলেছেন নাকি?

—চলুন না, চলুন না। এর পরে আর কোনো গাড়ি তো
না—বটকেষ্ট আছে পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান, সে-ই লাইন ক্লিয়ার দেবে।

খাতার শেষ পাতা

—ভোরবেলা আমাদের ট্রেনটা কখন ?

—আটটা ছত্রিশ, তারপরেই সাড়ে ন'টায় আর একটা আছে। আপিস-টাইমে গাড়ি একটু ঘন-ঘন থাকে।

—এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে বুঝি অনেকে ?

—করে না! ঐ তো চক্কোত্তি মশাই-র বড়ো ছেলে, খাশা চাকরি পেয়ে গেছে মশাই—পাশ-টাশ কিছু নয়, কপালটা একবার দেখুন। তারপর আমাদের হারাণ ঘোষ, আঠারো বছর বয়েসে ডেভিড কোম্পানিতে ঢুকেছিলো, এখন তো ষাট হ'তে চললো—এর মধ্যে একদিন কামাই করেনি, মশাই, একটা দিন কামাই করেনি। তা তার জন্যে কোম্পানি কি ওঁকে রাজা ক'রে দেবে? শুনছি তো আর এক বছর মেয়াদ, তারপরেই খালাস। আজকাল তো আর ধর্ম ব'লে কিছু নেই—খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপার। এই তো দেখুন, এই ইষ্টিশানে আমাকে ফেলে রেখেছে দু' বছর। কত লেখা-পড়া হাতে-পায়ে ধরা, তা কে কার কথা শোনে মশাই, কোম্পানির পেয়ারের লোক না হ'লে কিছুটি হবে না। আছি আরকি প'ড়ে পেটের দায়ে—কলকাতায় একটা পানের দোকান খুলতে পারলেও কোন্ জন্মে লাথি মেরে ছেড়ে দিতুম।

সাতপাশা গ্রামের ও মাষ্টারবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের নানা তথ্য শুনতে শুনতে এগিয়ে চললুম। বাড়িটা যত কাছে মনে হয়েছিলো ঠিক তত কাছে নয়।

চৌধুরী বাড়ির সিংহদরজা দিয়ে আমরা ঢুকলুম যখন, আবছা সন্ধ্যা ক'রে এসেছে।

চারদিক দেয়ালে ঘেরা প্রকাণ্ড চক্‌মশান বাড়ি। একতলার যে-

ঘরটায় সুনীতনাথ আমাদের নিয়ে গেলো, বুঝতে পারলুম সেটা বা
বসবার ঘর। মস্ত লম্বা ফরাস পাতা, ইয়া মোটা-মোটা তাকিয়া, রং
দেয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত-মস্ত আয়না ঝুলছে।
পেট্রোম্যাক্সের আলোয় সমস্ত ঘরটা একেবারে ধবধবে শাদা, ে
থালায় ঝকঝক করছে রাঙতায় মোড়া পানের পাহাড়।

সুনীত বললে, আরাম ক'রে বোসো তোমরা, এ-ঘরে আর
আসবে না। এখন কী ইচ্ছা তোমাদের? চা?

আমি বললুম, চা নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যস্ত হোয়ো না, বোসো।

মনে মনে আমরা সবাই অবাক হয়েছিলুম। এত বড়ো বিয়ে-বা
তার ভাব তো কিছুই দেখছিনে। ভেবেছিলুম আলোয় বুঝি ে
ঝলসে যাবে, রসুনচৌকির বাজনা ছাপিয়ে উঠবে লোকের অবি
কোলাহল—অপরিমিত ভোজের আয়োজনে সমস্ত পল্লীর মুক্ত বায়ু ক
হ'য়ে উঠবে। মনে মনে ভাবলুম, এত বড়ো বাড়ি—কোথায় কী
কে জানে, যথাসময়ে সবই টের পাবো।

কিন্তু অমিয়টা ব'লেই ফেললো: ওহে, বিয়ে-বাড়ির পক্ষে বড্ড চু
মনে হচ্ছে যে!

কথাটা শুনে সুনীতনাথের মুখের ভাব যেন [illegible] গেলো। ে
একটু হেসে বললে—লগ্ন অনেক রাত্রে কিনা, এখন সবাই একটু জি
বোধহয়।

—জিরুচ্ছে মানে? বিয়ের রাতে কেউ আবার জিরোয় নাকি?

সুনীতনাথ বললে—ভোজ তো আরম্ভ হয়েছে সকাল থেকেই,
থেকে বললেও দোষ হয় না। শহরের মতো ধরা-বাঁধা কাজ তো ন

খাতার শেষ পাতা

—দেশসুদ্ধ লোকের এক মাসের নেমন্তন্ন—য়্যাঁ? ঢোল পিটিয়ে দিয়েছিলে নাকি? ব'লে উমাপতি হেসে উঠলো। তা বর এসেছে তো?

—দুপুরবেলার গাড়িতেই এসেছে।

শশাঙ্ক বললে—তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য—

—বোসো তোমরা, দেখছি।

আর বেশি কিছু না ব'লে সুনীত উঠে চ'লে গেলো। উমাপতি মৃদু-স্বরে বললে—ব্যাপার কী হে, কেমন যেন লাগছে।

কেমন যেন লাগছিলো আমাদের সকলের। ভাবলুম মাষ্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু তাকিয়ে দেখি তিনি কখন্ অন্তর্হিত হয়েছেন। আমাদের মধ্যে উমাপতির লজ্জাভয় কম, সে বললে—চলো না নিজেরাই একটু দেখি-শুনি।

আমি বললুম—যাঃ!

—তাতে কী? বিয়ে-বাড়িতে অত কড়া আইন নেই তো, একটুখানি উঁকি দিয়েই দেখা যাক।

কৌতূহল আমারও হচ্ছিলো। ঘরের বাইরেই চওড়া বারান্দা, তারপরে শামিয়ানা-খাটানো প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ উঠোন। সেখানে এককোণে দেখা গেলো কয়েকটি স্ত্রীমূর্তি গালচের উপর ব'সে ঢুলছে। বাইজি, সন্দেহ নেই। ভালো কথা: কিন্তু সন্ধ্যে না হ'তেই তাদের ঘুমের ভাব কেন?

চারিদিকে তাকিয়ে বিশেষ-কিছু বোঝা গেলো না। কোনো ঘরে আলো জ্বলছে, কোনো ঘর অন্ধকার। লোকজনের সাড়াশব্দ আসছে মাঝে মাঝে, কিন্তু মোটের উপর চুপচাপ।

খাতার শেষ পাতা

—ব্যাপার কী, বলো তো? বললে উমাপতি।

—ব্যাপার আবার কী? আমার একটু বিরক্তই লাগছিলো উমাপতির অত্যধিক কৌতূহলে।

এদিকে সুনীতের দেখা নেই। অনেকক্ষণ পর সে এলো, পিছনে এক ভৃত্যের হাতে চা আর প্রচুর জলযোগ।

—কী হে, শশাঙ্ক বললে, কলকাতার রেস্তোরঁা থেকে আনালে নাকি চা?

—বড্ড দেরি হ'য়ে গেলো, কাঁচুমাচু মুখ ক'রে সুনীত বললে। কিন্তু কেন যে দেরি হ'লো সেটা বললে না। সত্যি বলতে, এত দেরি হবার কোনো কারণ আমি তো ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটু অদ্ভুতই ঠেকছিলো।

যাই হোক, খিদে পেয়েছিলো সকলেরই, খাবারগুলো অনায়াসেই উড়ে গেলো। তারপর সিগারেট আর গল্প।

ক্রমে রাত বাড়লো। শরদিন্দু এতক্ষণ আসর জমিয়ে পোলিটিক্যাল তর্ক করছিলো, এইবার গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে—কই হে, তোমাদের কতদূর?

তখন সুনীতনাথ বললে: আচ্ছা, চলো তোমাদের ও-ঘরে নিয়ে যাই।

আহারে আহ্বান মনে ক'রে আমরা সবাই উঠলুম। পাশেই আর একটা বড়ো ঘর, বিলিতি মতে সাজানো। সেখানে দেখলুম কয়েকজন ব'সে ঢুলছে, তাদের সামনে টেবিলের উপর ছোটে-ছোটো কাচের গেলাশে একটা সোনালি রঙের বস্তু টলমল করছে। সমস্ত ঘরে একটা তীব্র ও অতি পরিচিত গন্ধ। একটু পরেই চোখে পড়লো কোণে একটা টেবিলে রাশি-রাশি সারি-সারি বোতল সাজানো।

খাতার শেষ পাতা

—একেবারে ফ্রী বার খুলে দিয়েছো হে! প্রথম ধাকায় বেশ অবাকই হয়েছিলাম, মনে আছে।

—কিছু মনে কোরো না, ওটা আমাদের ফ্যামিলি ট্রাডিশন। না করলে চলে না।

ঘরের অর্দ্ধেকটা দখল ক'রে আমরা বসলাম, তারপর—তারপর আর কী বলবো। প্রথমটায় আমাদের খুব এক চোট কথা ছুটলো, হৈ-হৈ হাসাহাসির বন্যা, তারপর ক্রমেই কথাগুলো জড়িয়ে-জড়িয়ে আসতে লাগলো, তারপর আর যেন শোনাই গেলো না। কতক্ষণ কাটলো কে জানে।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে এক অতি জমকালো চেহারার যুবক আমাদের সঙ্গে এসে বসেছিলেন। সুনীতনাথ যেন বলেছিলো, ইনিই বর। ভালো ক'রে মনে পড়ছে না।

এক সময় আমার মনে হ'লো বেজায় ঘুম পেয়েছে। বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছুলে মনের সব বিকার লুপ্ত হয়; বন্ধুদের কথা একবারও চিন্তা না ক'রে আমি রওনা হলাম সেই মোটা তাকিয়া-শোভিত প্রশস্ত ফরাশের দিকে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই সমস্তটা ঘর বোঁ ক'রে একবার আমার মাথার চারিদিকে ঘুরে গেলো। হাতলটা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে নিজেকে সামলে নিলাম। চোখে যেন আবছা দেখছি, কানের কাছে পিঁ-পিঁ একটা আওয়াজ হচ্ছে। মনে হ'লো সুনীত যেন টেবিলে দু'পা তুলে দিয়েছে, শশাঙ্ক যেন প'ড়ে আছে মেঝেতে—থাক্‌গে। হাঁটতে গিয়ে দেখি, আমার শরীরের আর ওজন নেই, কিম্বা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আমাকে আর টানছে না, হাওয়ার উপর দিয়ে পরির মতো নেচে-নেচে

চলেছি যেন। বেরলাম ও-ঘর থেকে, কিন্তু যে-ঘরে ঢুকলাম সে
কোথায় তাকিয়া, কোথায় ফরাশ। মেঝেতে মাদুর বিছোনো, সে
কতগুলো মানুষ গড়াগড়ি যাচ্ছে, যেন খোলশ-ছাড়ানো মাংসের স্তূ
তারপর যেন একটা দুঃস্বপ্ন আরম্ভ হ'লো। এ-ঘর থেকে বারান্দা, আ
বারান্দা থেকে ও ঘর, আর চলতে-চলতে পথে পথে মানুষের গায়ে হোঁ
খাচ্ছি, হয়তো মাড়িয়েও যাচ্ছি, কিন্তু কেউ একটু নড়ছে না। মেয়ে, পু
ছোটো ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর। যেন এক যুদ্ধক্ষেত্রের বিধ্বস্ত দৃশ্য ঘু
ঘুরে দেখছি আমি একমাত্র জীবিত। হঠাৎ একজায়গায় দেখি মাং
পাহাড়, পোলাওয়ের পাহাড়, কত রাশি-রাশি রান্না-করা জিনিস বড়ো-ব
ধামা-ভরা, আর তারই মধ্যে কয়েকটা রাঁধুনে বামুন গড়াগড়ি যাচ্ছে
প'ড়ে-থাকা খাদ্যবস্তুর তীব্র কটু গন্ধে হঠাৎ আমার এক ঝলক বমি হ'
গেলো। ভূমাতার আকর্ষণ অতি তীব্রভাবে সমস্ত শরীরে অনুভব করলুম
মনে হ'লো ওখানেই বুঝি শুয়ে পড়েছি—কিন্তু কী আশ্চর্য, হঠাৎ দে
সেই তাকিয়াশোভিত ঘর। কী ক'রে এলাম এখানে? ফরাশে প'ে
আছে তিনজন স্ত্রীলোক—ঐ বাইজিরা। আর এক ধারে কয়েকজন পুরু
—কে জানে কে। সকলেই অচেতন। একেবারে এককোণে আমি
একটুখানি জায়গা ক'রে নিলুম। তারপরেই দেখি ভোর হয়েছে। আর
আমার পায়ের তলায় দেখি লম্বা হ'য়ে ঘুমুচ্ছে উমাপতি।

সমস্ত ব্যাপারটা মনে আনতে একটু সময় লাগলো। তাকিয়ে দেখি,
অজ্ঞান হ'য়ে সব প'ড়ে আছে, সমস্ত বাড়িটা ঘুমের প্রাসাদের মতোই চুপ।
আমার হাতঘড়িতে দেখলুম সাড়ে সাতটা। তক্ষুনি মনে পড়লো আটটা-
ছত্রিশে কলকাতার গাড়ি। উঠে বসলুম।

খাতার শেষ পাতা

উমাপতির চুল ধ'রে ক'ষে ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম : এই ওঠ, ওঠ।

উমাপতি একটু নড়লো না, একটু শব্দ করলো না। সে যে বেঁচে আছে তার লম্বা ভারি নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়া ছাড়া আর-কোনো লক্ষণ তার নেই।

চেঁচিয়ে মেরে থাম্‌চে কোনোরকমে ওকে তো জাগালাম। চোখ মেলেই ও বললে—উঃ!

—চল্‌, চল্‌। শিগগির।

—বড্ড মাথা ধরেছে।

—তা মাথার আর দোষ কী? চল্‌।

—কোথায়?

—ষ্টেশনে। কলকাতায়।

—কল্‌!

উমাপতি আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলো, মাথায় এক চাঁটি মারতেই তড়াক্‌ ক'রে উঠে বসলো। কোনোরকমে ওকে নিয়ে বেরলাম। আর কে কোথায় জানিনে। খোঁজবার সময় নেই। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে। এক মাইল রাস্তার মধ্যে একটা লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো না, একটা কুকুর পর্য্যন্ত চোখে পড়লো না। বোধহয় বিয়ে বাড়ির পাত চেটে-চেটে সমস্ত জেলার কুকুর অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে।

আটটার কিছু পরে ষ্টেশনে এসে পৌছনো গেলো। রিটার্ন-টিকিটের টুকরোগুলো সব ছিলো সুনীতের পকেটে; টিকিট কাটতে হবে। খুপরি দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাঁকডাক দিলাম, কোনো সাড়াশব্দ নেই। অগত্যা

খাতার শেষ পাতা

ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়লুম—ঢুকে দেখি আমাদের কালকের অমায়িক মাষ্টারবাবু মেঝের উপর প'ড়ে গভীর নিদ্রা যাচ্ছেন, আর তাঁরই পায়ের কাছে কুকুরের মতো গোল হ'য়ে পড়ে আছে নীল কোর্তা পরা একজন লোক—এ-ই যে সাতপাশা ষ্টেশনের পয়েন্ট্স্‌ম্যান বটকেষ্ট তা বুঝতে বিশেষ অনুমানশক্তি প্রয়োগ করতে হয় না।

দু'জনে মিলে প্রাণপণ ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কি ক'রেও কাউকে জাগানো গেল না। গাড়ি আসবার সময় হ'য়ে এলো—নিরুপায় হ'য়ে দু'দিক থেকে বটকেষ্টকে প্রাণপণে লাথি মারতে আরম্ভ করলুম। বেচারা উঠে বসতে-না-বসতেই আরো দুটো লাথি মেরে বললাম—যা, যা শিগগির। ট্রেন আয়া।

নেশার তমিস্রা থেকে হঠাৎ আলোয় উঠে এসে বটকেষ্ট কী ভাবলে সে-ই জানে, প্রাণপণে দু'হাতে সেলাম করতে-করতে গেলো ছুটে সিগ্‌নাল ডাউন করতে। ততক্ষণে দূরে গাড়ির ধোঁয়া দেখা গেছে।

যাই হোক্, কলকাতায় তো ফিরে এলুম দু'জনে। হাওড়া ষ্টেশনে ডবল মাশুল দিয়ে রেহাই পেলাম—সুখের বিষয় সেটা বিশেষ-কিছু নয়। সুনীতনাথের বোনের যথাযোগ্যভাবে বিবাহ হয়েছিলো নিশ্চয়ই—কিন্তু কোন অচেতন লোকেরা মূর্ছিত বরকে এনে সভায় বসিয়েছিলো, কোন্ অজ্ঞান পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করেছিলেন, সমস্ত অনুষ্ঠান-পালনই বা করেছিলো কারা, সে-সব কথা ভাববার মতো অবস্থা তখন আমাদের আদৌ ছিলো না। সন্ধ্যেবেলায় সমস্ত দল ফিরে এলো—সঙ্গে সুনীতনাথ। সুনীতনাথের সঙ্গে দেখা হ'তে সে শুধু বললে, 'তোমরা দু'জন না-খেয়েই চ'লে এলে দাদা আমাকে কত বকলেন।'

খাতার শেষ পাতা

একটা কথা শুধু জানতে ইচ্ছা করছিলো। আমাদের সেই মাষ্টার-বাবুর কি এ-ঘটনার পরেও চাকরি আছে? যদি চাকরি গিয়ে থাকে, তাহ'লে তাঁকে পানের দোকান খোলবার জন্য কিছু টাকা আগাম করতে আমি মনে-মনে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলুম। কিন্তু তাঁর আর কোনো খবর পাইনি।

১৩৪৩

রোদ

বারো বছর আগে, তারা সকলেই যখন কলেজের ছোকরা, তখন এই শহরেই তারা দল বেঁধে হো-হো ক'রে ফিরেছে; গুরুজনের শাসন শোনেনি, স্বাস্থ্যের নিয়ম মানেনি; হয়তো বেরিয়ে পড়েছে বেলা এগারোটাতেই, উশকোখুশকো চুল, পায়ে স্যাণ্ডেল, রেল-লাইন পার হ'য়েই চাটগেঁয়ে চায়ের দোকান, সেখানে, চা, কচ্ছপের ডিম আর সিগারেটের টিন নিয়ে একটা বাজিয়েছে; ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে তিন মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরেছে; একবার টিকাটুলিতে সুনীলদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে ঠিক পল্টনের মাঠের মধ্যে নামলো বৃষ্টি, তারা দাঁড়ালো না, গতি তাদের একটুও দ্রুত কি মন্থর হ'লো না, ঠিক যেমন হাঁটছিলো তেমনি হৈ-হৈ করতে-করতে গন্তব্যে এসে পৌছলো, খুব যে একচোট ভিজতে পেরেছে, আজকের মতো এটাই চরম স্ফূর্তি।

গন্তব্য অবশ্য সুরথেরই বাড়ি। মাঠের মধ্যে একটি টিনের [illegible] সুরথ তার বিধবা মা-র সঙ্গে থাকতো, সেই ঘরেই ছিলো আড্ডাটির কেন্দ্র। এতদিনে সে-ঘরটির অতি জীর্ণ চেহারা হয়েছে, এখন সেখানে পাড়ার মেয়ে-ইশকুল বসে। ঘরটি চোখে পড়লে সুরথের এখন মনে হয়: 'ঈশ—এখানে কেমন ক'রে ছিলুম! আগাগোড়া টিন—কী সাংঘাতিক গরম! উঃ!'

কিন্তু ঐ ঘরে ছ'টি বছর, ছ'টি গ্রীষ্ম সে কাটিয়েছে, তার মধ্যে একটি

দিনও গরমে কষ্ট পেয়েছে ব'লে মনে করতে পারে না। ছেলেবয়েসে কি আর বোধচৈতন্য থাকে।

এমন-কোনো ঋতু নেই, দিন-রাত্রির এমন কোনো সময় নেই, যখন ঐ ঘরটিতে তাদের বিচিত্র দলটি একত্র না হয়েছে; তাদের মধ্যে কেউ কারো মতো নয়, কিন্তু সকলেরই তরুণ প্রাণ ফুর্তির নেশা-ধরা; অপরিমিত চা, অগুনতি সিগারেট, আর অফুরন্ত গল্প, কখনো উদ্দাম হাসি, প্রগল্‌ভ ঠাট্টা, কখনো বা গম্ভীর ও করুণ হৃদয় উদ্‌ঘাটন। একবার তো সারা-রাত জেগে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' (তখন সদ্য-প্রকাশিত) পড়া হ'লো—সকলেরই ঘুম পেয়েছিলো, কিন্তু কেউ সে-কথা স্বীকার করেনি।

আষাঢ়ের সেই সকালবেলায়, যখন সবুজ মাঠ কখনো আলোয় উজ্জ্বল, কখনো ছায়ায় স্নিগ্ধ, আর থেকে-থেকে হাওয়ার ঝাপটা সাদা আর ছাইরঙের মেঘগুলোকে আকাশ ভ'রে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে, সুরথের হঠাৎ এ-সব কথা মনে পড়লো। ঠিক যে সব কথা মনে পড়লো তা নয়; ঘুম থেকে উঠে সে তার বড়ো মেয়ের হাত ধ'রে বাগানে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ ভিজে ঘাসের একটি মধুর তীব্র গন্ধে সে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো, মনে হ'লো যেন সেই দিনেই ফিরে এসেছে যখন ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরবেলায় ফাঁকা মাঠের মধ্যি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সে হো-হো ক'রে ফিরেছে।

এবার এই শহরে সে আছে প্রায় দু'মাস, গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি সে এখানেই কাটালো, কিন্তু এ-রকম অনুভূতি আজকেই তার প্রথম। কলকাতায় সে আছে তাও প্রায় দশ বছর হ'তে চললো, এখানকার সঙ্গে সমস্ত বন্ধনই তার ছিন্ন, তার স্ত্রী যদি এই শহরেরই মেয়ে না হ'তো, তাহ'লে এখানে হয়তো সে আর কখনোই ফিরতো না। স্ত্রীর উপলক্ষ্যে

বছরে একবার এখানে আসতেই হয়, কোনো-না-কোনো ছুটি শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে যায়। কলকাতার হট্টগোলের পর এখানে তার ভালোই লাগে কিন্তু সে-ভালো-লাগার মধ্যে পুরোনো দিনের স্মৃতির কোনো আন্দোলন নেই, কখনো তার মনে হয় না তারই পুরোনো জায়গায় সে ফিরে এসেছে যেমন সে মাঝে-মাঝে কলকাতার বাইরে নানা জায়গায় বেড়াতে যায় এ-ও তেমনি। এখানে চারিদিক চুপচাপ, বাড়িটি নিরিবিলি, হু-হু হাওয়ার বিরাম নেই; এখানে পাখি ডাকে, ফুল ফোটে, সবুজ ঘাস বৃষ্টিতে বেড়ে ওঠে, এখানে সূর্যাস্তের সময় আকাশের পুবে আর পশ্চিমে দু'রকমের রঙের খেলা পাশাপাশি চলতে থাকে—এ সবই ভালো লাগে সুরথের। ভালো লাগে, কিন্তু কখনো মনে হয় না সে এখানকারই। রমনার নির্জ্জন, সুন্দর রাস্তাগুলি দিয়ে যখন হাঁটে এ-কথা কখনো মনে হয় না যে এই তার প্রথম যৌবনের লীলাভূমি, এই সব রাস্তা দিয়েই সে রোজ কলেজে গেছে, কলেজ থেকে ফিরেছে, বন্ধুদের সঙ্গে হল্লা করতে-করতে ঘুরে বেড়িয়েছে, অস্ফুটস্বরে লাগসই কোটেশন বিড়বিড় করতে-করতে পরীক্ষার আগে হল্ এর সামনে পায়চারি করেছে, তাও এখানেই, রোদে বর্ষায় জ্যোছনায় এই ঘাস, এই শুকনো কি পচা পাতা পড়েছে তার পায়ের নিচে, এই সব চোরকাঁটার পূর্বপুরুষেরাই বিঁধেছে তার কাপড়ে। যদি বা মনে পড়ে, তাতে কোনো আবেগের ছোঁয়া লাগে না। তার মনের নির্লিপ্ততায় সে নিজেই একটু অবাক হ'য়ে যায়। আর এখানকার গাছপালা, পথঘাট, বাড়িঘর—এরাও উদাসীনভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে কাছে ডাকে না, তাকে দাবি করে না, একদিন যে সে এদেরই মধ্যে নিতান্তই এদের একজন ছিলো, তার কোনো চিহ্নই এরা রাখেনি। মনে হয় যেন এ-শহর

রংপুর কি সিলেট কি পাটনা হ'তে পারতো—সুরথের পক্ষে তাতে কিছুই তফাৎ হ'তো না। এখানে যে সে আগন্তুক তা সেও যতটা জানে, সবুজ মাঠ-চেরা ছাইরঙের সরু রাস্তাগুলোও তার চেয়ে কম জানে না।

অন্য জায়গার সঙ্গে এখানকার একটু যা তফাৎ, যা, সত্যি বলতে, সুরথের পক্ষে একটা আকর্ষণ, তা এই যে সেই আদি দলটির দু'একজন এখনো এখানেই রয়েছে। যে-কলেজে তারা ছাত্র ছিলো এখন সেখানেই তারা শিক্ষক। তাদের সময়কার অধ্যাপকরা এখনো অনেকেই রয়েছেন, কিন্তু আর দশ বছর পরে এই বিদ্যালয়ে এমন একজন শিক্ষকও হয়তো থাকবেন না, যিনি তাদের পড়িয়েছেন। এখনো তারা অল্প বেতনের বয়োকনিষ্ঠের দলে, কিন্তু আরো দশ কি পনেরো বছর পরে হয়তো দেখা যাবে তারা অধিনায়কদের শিবিরে জায়গা ক'রে নিয়েছে, আর তখনো যদি সুরথের গ্রীষ্মের ছুটিতে এখানে আসতে হয়, তাহ'লে বন্ধুদের দেখা পেতে হ'লে তাকে যেতে হবে রমনার এক-একটি প্রাসাদে, কিংবা গিয়েও দেখা পাবে না, কারণ তারা কেউ তখন কাশ্মীরে, কেউ বা উটিতে।

জীবনে আমাদের যে-পরিবর্তন হয় তা এমনি তুচ্ছ। আমরা ছোটো বাড়ি থেকে বড়ো বাড়িতে যাই, বছরে দু'খানার বদলে চব্বিশখানা ধুতি কিনি, পুত্রকন্যার সংখ্যা বাড়ে, স্ত্রীরা মোটা হন, আর-কিছু না। আর-কিছু হয় না। জীবনের আসল সুর যেটা, সেটা কবে ভুলে গেছি, কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

২

হঠাৎ ঘাসের গন্ধে সুরথের মনে হ'লো, পেয়েছি, ফিরে পেয়েছি। রে
বৃষ্টিতে হৈ-হৈ ক'রে বেড়িয়েছে, হঠাৎ অসময়ে বন্ধুরা এসে হা
হয়েছে, পাটি-ফেলা খাটে ব'সে উরুর উপর কনুই রেখে আড্ডা—আক
কখনো মেঘ, কখনো রোদ, বিস্তীর্ণ ঘাসে কখনো বৃষ্টির আব্রু, কখ
হলদে কি গোলাপি আলো, হাতে এত সময় যে সময় নষ্ট হবার
নেই—এ যেন তারই, এ যেন তারই একটি দিন। সুরথ ঠিক ক'রে ফেল
অনুপমের বাড়ি যাবে, এখনই, চা খেয়ে নিয়েই। অনুপমের সঙ্গে রে
প্রায় দেখা হয়, কিন্তু সন্ধ্যেবেলায়; সকালবেলার আড্ডার যে এ
বিশেষ স্বাদ আছে, তার জন্যে সে লুব্ধ হ'য়ে উঠলো।

জামা প'রে সে চুল আঁচড়াচ্ছে, তার স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস ক
'কোথাও যাচ্ছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'অনুপমদের বাড়ি।'

'তোমার না আজ বিকেলে যাবার কথা?'

'যাই এখনই।'

লিলি বাইরের দিকে একটু তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বললে, 'যা
একটা গাড়ি নিয়ে যাও।'

খাতার শেষ পাতা

'না—না—গাড়ি লাগবে না। হেঁটেই যাবো,' ব'লে সুরথ সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

লিলি তার পিছনে ডেকে বললে, 'ফেরবার সময় গাড়িতে এসো কিন্তু।'

সুরথ কিছু বললে না, মনে-মনে হাসলো। গাড়ি সে করবে না, ফেরবার সময়ও না। একটা কাঠের বাক্সে সে উঠে বসবে, আর দুটো মুমূর্ষু ঘোড়া অতি অনিচ্ছায় তাকে টেনে নিয়ে যাবে, কথাটা ভাবতেই আজ তার অত্যন্ত হাসি পেলো। আজ সমস্ত পৃথিবীই তাকে বাইরে ডাকছে। বাইরে, আকাশের তলায়, অবারিত হাওয়ার ঝাপটায়, ঘাসের গন্ধে, আকাশের, মেঘের রঙে। কী সুন্দর পৃথিবী আমাদের! চোখ, নাক, কান, আর আমাদের এই শরীরের চামড়া—এরই ভিতর দিয়ে সমস্তটা পৃথিবী আমাদের রক্তে-মজ্জায় মিশে যেতে চায়—কেন আমরা দূরে ঠেলে রাখি, সরিয়ে দিই? রমনার রাস্তায় দ্রুত, লঘু পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে সুরথের মনে হ'লো এত ভালো তার শিগগির লাগেনি, একটি নিটোল উজ্জ্বল সুখ যেন অযাচিত করুণায় এইমাত্র তার বুকের মধ্যে নামলো। এই সুখের কারণ কী? কিছুই না—আকাশের তলায়, হাওয়ার ঝাপ্‌টায় সে হেঁটে চলেছে বন্ধুর বাড়ি, আশে-পাশে পাখি ডাকছে, সবুজ ঘাসের ডগায় হলদে রোদ ঝিল্‌মিল্‌ করছে, আর মাঝে-মাঝে মেঘের ছায়ায় তার সামনেকার অনেকখানি পথ ধূসর হ'য়ে যাচ্ছে, যদিও পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড লম্বা বাড়িটা রোদে উদ্ভাসিত।

অনুপমদের বাড়ি তাদের বাড়ি থেকে এক মাইলের কিছু উপরে। আদ্ধেক রাস্তার বেশি সুরথ যেন এক নিঃশ্বাসে চ'লে এলো, তারপর রাস্তার

একটা বাঁক ফিরতেই হঠাৎ একেবারে চোখের উপরে এসে পড়লো দৃষ্টি-অ করা সূর্য, অনেকক্ষণ মেঘের ছায়া পড়লো না, সুরথের নিচের জামাটা ঘ ভিজে উঠলো, কিন্তু এক্ষুনি পৌঁছিয়ে যাবে, এই আশ্বাস তাকে ক্লান্ত ে করতে দিলো না। একখানা হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে সে আ একটু তাড়াতাড়ি পা চালালো, তাতে ঘাম ঝরলো বেশি, নিঃশ্বাস ভ হ'লো, কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই সে অনুপমের কলিং বেল টিপলো।

অনুপম তাকে দেখে মহা খুশি।—'আমি ভাবছিলাম তুমি এখন এ চমৎকার হয়। কিন্তু সত্যি যে আসবে তা অবিশ্যি আশা করিনি।'

মিনিটখানেক সুরথ কিছু বলতে পারলে না; বাইরের আলোর বন্যা থে ঘরের মধ্যে এসে সে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিলো না, কান দুটো ঝাঁ করছিলো, নিঃশ্বাস পড়ছিলো জোরে। অনুপম পাখা খুলে দিলে, বা থেকে হঠাৎ একটা হওয়ার ঝাপটা এসে পাখার হাওয়া উড়িয়ে নি গেলো।

সুরথ বললে, 'পাখার দরকার নেই।'

অনুপম বললে, 'ঠাণ্ডা হ'য়ে নাও।'

ঠাণ্ডা হ'তে দেরি হ'লো না, সুদৃশ্য সেটে চা এলো, দেখতে-দে এগারোটা বাজলো।

সুরথ বললে, 'এখন উঠি।'

অনুপম বললে, 'আর-একটু বোসো।'

সুরথ চেয়ারে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললে, 'তোমাদের সঙ্গে ক্ষিতীশ চাটুয্যে পড়তো সে আজকাল কী করছে?'

সাড়ে-এগারোটা বাজলো। সুরথ আবার বললে, 'এখন উঠতেই হ

কিন্তু সে উঠলো যখন, বারোটা বেজে গেছে। অনুপম বললে, 'একটা গাড়ি আনিয়ে দিই।'

সুরথ খুব একটা ফুর্তির সুরে বললে, 'গাড়ি লাগবে না। হেঁটেই চ'লে যাবো।'

'বলো কী! এই রোদ্দুরে! বোসো একটু, গাড়ি আনিয়ে দিচ্ছি।'

সুরথ একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললে, 'আজকের রোদ্দুরটি ভারি চমৎকার। এই মেঘ, এই রোদ।'

অনুপম বললে, 'ভারি গরম।'

'না, না, গরম কোথায়!' সুরথ তীব্র প্রতিবাদ করলে। 'সারাদিন কী হাওয়া! আর আকাশ কী নীল, দেখেছো!'

গাড়ি সুরথ কিছুতেই নিলে না, মনের মধ্যে একটা অহেতুক, অযৌক্তিক ফুর্তির গুনগুনানি নিয়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লো। দুপুর-বেলার হাওয়ায় গাছের পাতায়-পাতায় শোঁ-শোঁ, মরমর শব্দ, পাখিদের চ্যাঁচামেচি থেমে গেছে, কিন্তু কোথায় একটা নিঃসঙ্গ, অক্লান্ত পাখি থেকে-থেকে কেবলি ডেকে উঠছে। আকাশ যেখানে মেঘমুক্ত সেখানে আশ্চর্য নীল, একদিকে কালো মেঘের মাথায় রুপালি আগুন জ্বালা। প্রতি ঋতুতে, প্রতি দিনে ও রাত্রিতে পৃথিবী ও আকাশের রঙ্গমঞ্চে কত সৌন্দর্যের জন্ম ও মৃত্যু, ভাবতে বুক ভ'রে ওঠে, বুক ভেঙে যেতে চায়।

খানিকদূর হেঁটে সুরথ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো, যদি একটা গাড়ির দেখা মেলে। হাওয়াটা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে গরমে শরীর যেন তার জ্বালা করতে লাগলো। একটা বট গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরালো—কী সুন্দর নীল আকাশ। কিন্তু

এখানে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও যে গাড়ি পাওয়া যাবে এমন ঘ
নেই। যতদুর দেখা যায় রাস্তায় সে-ই একমাত্র যাত্রী। সমস্ত পাড়া
বিশ্ববিদ্যালয়ের, এখন ছুটির সময় হস্টেলগুলো শূন্য, রাস্তায় লোক চ
বিশেষ নেই, বিশেষ এই দুপুরবেলায়…

গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিয়ে সে আবার রওনা হ'লো।
অসম্ভব ঘামছে সে। সিগারেটটা বিশ্রী লাগছে, দিলে ফেলে। ।
বাঁধানো রাস্তা নির্মম রোদে মড়ার মতো প'ড়ে আছে—এখনো ক
রাস্তা তাকে যেতে হবে। গাড়ি একটা নিলেই পারতো।

আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার সারা গায়ে আলপিন ফুটতে লাগ
চুলের গোড়া-পর্যন্ত ঘামে ভিজে গেলো, রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মু
বিরক্ত হ'য়ে সে রুমাল পকেটেই ভ'রে রাখলো—দেখি, কত ঘ
পারে। বাড়ির কাছাকাছি এসে তার মনে হ'লো এতখানি কায়িক
জীবনে সে কখনো করেনি। আর বাড়ি পৌঁছুতে লিলি যখন জি
করলে, 'এত দেরি করলে যে?' তখন তার স্নাত, প্রশান্ত,
ঝিরঝিরে চেহারাটি দেখে সুরথের এমন রাগ হ'লো যে
কথার জবাব দিতে গিয়ে একটা নিষ্ঠুর কিছু ব'লে ফ্যালে সে-ভয়ে
কোনো কথাই বললে না, দুমদাম ক'রে উপরে উঠে জামাটা একটানে
থেকে খুলে চিৎপাৎ হ'য়ে খাটের উপর শুয়ে পড়লো।

১৩৪৭

সত্যি-সত্যি রোমান্স

সকালের ডাকে নবকান্ত চারখানা চিঠি পেলো। একখানা তার ব্যাঙ্ক থেকে : লিখেছে যে তার ওভারড্রাফ্‌ট অ্যাকাউন্ট দিন-দিন বেড়ে চলেছে, এবারে ভরাট হ'লে ভালো হয়। এ-চিঠিখানা সে রেখে দিলে টেবিলের দেরাজে, জবাব দিতে হবে। দ্বিতীয় চিঠি এসেছে 'পরিক্রমা' নামক সংস্কৃতিবান মাসিকপত্র থেকে; নীটশে সম্বন্ধে তার প্রবন্ধটির জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আচ্ছা, বেশ। তারপর দেখা গেলো বিজয়ের চিঠি এসেছে রেঙ্গুন থেকে, সমুদ্র-যাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা ছ'পাতা জোড়া। বছরখানেক ধ'রে বন্ধুদের মধ্যে বিজয়ের সঙ্গেই তার সবচেয়ে বেশি মেলামেশা, তবু ও-চিঠিখানার উপর চোখ বুলিয়েই সে ফেলে দিলে বাজে-কাগজের ঝুড়িতে। তারপর শেষের খামখানা যেন অপরিচিত গোল গোল হস্তাক্ষরে লেখা; খুলতেই বেরিয়ে এলো একখানা হলদে রঙের সিনেমার টিকিট, নিউ এম্পায়ার, সাড়ে ন'টা ড্রেস-সার্কল্‌। সঙ্গে ছোট্ট একটু কাগজে লেখা : 'এই টিকিট নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই আজ নিউ এম্পায়ারে আসবেন, আমি আপনার আশায় থাকবো।'

নাম নেই ঠিকানা নেই, শুধু ঐ এক লাইন। হাতের লেখাটা নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের।

এই চিঠি হাতে নিয়ে নবকান্ত ব'সে আছে, এমন সময় রোহিণী ঢুকলো ট্রে-তে ক'রে তার ছোটো হাজরি নিয়ে। তার সামনে একটা

কাচ-বসানো গোল টেবিলে ট্রেটা রেখে রোহিণী জিজ্ঞেস করলে: '
আজ কী খাবেন?'

নবকান্ত জবাব দিলে: 'ছাখো রোহিণী, রোজ-রোজ আমাকে ও-
জিজ্ঞেস কোরো না। তুমি যা রাঁধবে তাই খাবো, আর তুমি কী রাঁ
তা তুমি জানো।'

ধমক খেয়ে রোহিণী চুপ ক'রে রইলো।

পেয়ালায় চা ঢালতে-ঢালতে নবকান্ত বললে: 'আচ্ছা রোহিণী,
হ'লে কী করতে?'

'আজ্ঞে?'

'ধরো, তোমাকে কেউ বললে: আজ অতটার সময় অমুক সিনে
যেয়ো। ধরো তোমাকে একখানা টিকিটও দিয়ে দিলে। যেতে তুমি

'আজ্ঞে।'

'আজ্ঞে! ভালো ক'রে একটা কথা বলতেও শেখোনি? যেতে
না, যেতে না?'

'আজ্ঞে টিকিট যখন পাওয়া যাচ্ছে, দেখে এলেই তো হয়।'

খুদে চামচে দিয়ে একটি ডিম ভক্ষণ করতে-করতে নবকান্ত বলে
'তাই তো! তোমার বুদ্ধিটা দেখছি ভালোই। এ-কথা তোমার মনে
হ'লো না যে এর মধ্যে কারো কোনো মৎলব থাকতে পারে?'

রোহিণী চুপ ক'রে রইলো।

'ধরো কেউ তোমাকে দিয়ে নিজের কোনো কাজ করিয়ে নিতে চা
তোমার ক্ষতিই করতে চায়, ধরো না! যে তোমাকে যেতে ব
তাকে তুমি চেনো না, এমন কি তার নামও জানো না।'

'তাহ'লে অবিশ্যি অন্য কথা।'

'ও, আমি বুঝি তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম বন্ধু সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইলে যাবে কি যাবে না? এ-রকম বুদ্ধি ব'লেই তো চাকরের কাজ ক'রে জীবন কাটালে!

'তা জীবনটা মন্দ কাটলো কী বাবু!'

'যাও যাও, তোমাকে আর বক্তৃতা করতে হবে না।' পাশের টেবিল থেকে নবকান্ত তুলে নিলে ভাঁজ করা খবরের কাগজ। প্রথমেই খুললে প্রমোদের পাতা। নিউ এম্পায়ারে আজ 'ব্লু এক্স্‌প্রেস' নামে একটা ছবি; নিচে যে-কটা 'নক্ষত্রের' নাম সবই তার অচেনা। বহুদিন সে সিনেমায় যায় না। এককালে খুবই যেতো, সে অভ্যেস কখন অলক্ষ্যে খ'সে পড়েছে, এখন বছরে একটাও হয় কি না হয়। পরদার উপর ছায়ার মিছিলের চাইতে সাক্ষাৎ জীবন দেখতেই তার বেশি আনন্দ। আর 'জীবন' দেখবার অনেক সুযোগ অবিশ্যি আছে তার। অনুপার্জিত যে অর্থ তার কাছে এসেছে তাতে তার কোনো ভাবনা-চিন্তা না-ক'রে দিব্যি চ'লে যায়—মাঝে-মাঝে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিতে হয়, এই যা। থাকে সে একা কলকাতায় পাঁচ বছরের পুরোনো চাকর রোহিণীকে নিয়ে। পরিবারের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখেনি, বিয়ে করেনি, পড়াশুনো করেছে। কোনো দায়িত্বে পীড়িত নয় তার জীবন, কোনো দৈনন্দিন ক্ষুদ্র উৎপাতে কণ্টকিত নয়, কোনো বৃহৎ স্নেহে আবদ্ধ নয়। বন্ধু তার অনেক; তাদের মধ্যে কাউকে হারালে কষ্ট নেই, নতুন বন্ধু করতে সময় লাগে না। ড্রয়িংরুম থেকে ড্রয়িংরুমে তার নিত্য পরিক্রমণ, খেয়াল হ'লে দু' একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লেখে, আড্ডায় অরুচি ধরলে

একটা দিন ঘরে বন্ধ হ'য়ে বই প'ড়েই কাটালো। এমন ভেসে-বেড়াই
ভাবনা-নেই গোছের তার জীবন, হাওয়ার মতো চলেছে যেথানে খুশি
স্রোতের মতো তার মনের মধ্যে একটা অফুরন্ত চঞ্চলতার ছলছলানি।

নিউ এম্পায়ারে 'ব্লু এক্সপ্রেস' দেখতেই তাহ'লে সে আজ যাবে
কেন যাবে? কেন যাবে না? হয়তো এটা কোনো বন্ধুর রসিকতা
কেমন অর্থহীন রসিকতা বলো তোঃ বড়ো জোর সে একা ব'সে-ব'
ছবি দেখে আসবে, জব্দটা হবে কোথায়? হয়তো কোনো চক্রান্ত··
হাসি পেলো নবকান্তর কথাটা ভেবেই। এমন কিছু কেষ্ট-বিষ্টু গোছে
লোক নয় সে, যাতে তার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত হওয়া সম্ভব। তা
সে-রকম কোনো শত্রু নেই; তাকে খুন ক'রে কারো লাভ নেই কোনো
আর তাকে প্যাঁচে ফেলে কিছু আদায় ক'রে নেয়া—কী আদায় করবে
বড়ো জোর কিছু টাকা। তা ছেলেবেলা থেকে কখনো অভাব জানে
ব'লে টাকা সম্বন্ধে সে উদাসীন। গেলে যাবে। তাই ব'লে ভয় পাবে ি
সে? আবার ছাখো, কি ভয়ানক রোম্যান্টিক ব্যাপার, আস্ত রোমান্সে
সূত্রপাত। কে-এক অপরিচিতা (সুন্দরী নিশ্চয়ই, যুবতী নিশ্চয়ই
তার জন্যে আজ অপেক্ষা করবে সাড়ে ন'টায় নিউ এম্পায়ারে। না-গি
পারে কি সে? হয়তো অপরিচিতা কোনো বিপদে পড়েছে, হয়তে
আসলে সে অপরিচিতাই নয়, হয়তো···হয়তো···কত বিচিত্র আশ
সম্ভাবনা দেখতে পেলো নবকান্ত, কত রঙের মিছিল, কত বিদ্যুতে
ঝিলিক। তার হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার মতো আঁকাবাঁকা আবছ
কল্পনা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠলো তার মনের ডালপালা জড়িয়ে। ঢুকে
রোহিণী নিঃশব্দে, যতটা আস্তে সম্ভব বললে, 'এগুলো নিয়ে যাবো?'

নবকান্ত হাত দিয়ে ইশারা করলে, কিছু বললে না।

'স্নানের জল দিয়েছি।'

নবকান্ত মাথা নাড়লো ; তার মানে যাচ্ছি।

রোহিণী তবু দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে বললে: 'বাজারে যাবো—'

এবার চোখ তুলে নবকান্ত বললে: 'এটা এমন কী মহামূল্য খবর যে আমাকে না-জানালেই চলছে না ?'

'আপনার কাছে যদি টাকা থাকে—' রোহিণী এমন ভাবে কথাটা বললে যেন বাজারের পয়সা দেয়াটা নবকান্তের কর্তব্য নয়, যেন সে নিজেরই জন্য একটা অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে।

'টাকা ! কাল দু' টাকা দিলুম, সব খরচ হ'য়ে গেলো !'

'আজ্ঞে মাখনের টিন এলো, আর বিকেলে আইসক্রীম সন্দেশ—'

'থাক্, থাক্, আর শুনতে চাইনে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে দেরাজ টেনে নবকান্ত তার মনিব্যাগ বে'র ক'রে উপুড় ক'রে ঢাললে টেবিলের উপর। একটা দশ টাকার নোট, গোটা দুই খুচরো টাকা আর কিছু সিকি-দুয়ানি ছড়িয়ে পড়লো।

'এই তো আছে। তার উপর ব্যাঙ্ক চিঠি লিখেছে তাগাদা দিয়ে। নাও এখন, এর থেকে যা খুশি তুলে নাও।'

একটা টাকা রোহিণীর দিকে ঠেলে দিয়ে বাকিগুলো সে গুনে-গুনে ব্যাগে ভ'রে রাখলো। আরো কিছু থাকলে ভালো হ'তো। কে জানে আজ যদি দরকার হয়।

২

ন'টা পঁচিশ মিনিটে সে নিউ এম্পায়ারের লিফ্ট থেকে নেমে ড্রেস-সার্কল-এর দরজার কাছে দাঁড়ালো। ক্রিং-ক্রিং ঘণ্টা বাজছে অন্যান্য দর্শকদের সঙ্গে সে-ও পড়লো ঢুকে। তার টিকিটের নম্বর একত্রিশ। একটা গলির ধারে তিরিশ নম্বর, পাশের চেয়ারটা তার। তার ডানদিকে এক জাঁদরেল জন বুল ব'সে পাইপের ধোঁয়া উগরোচ্ছে বাঁ দিকের তিরিশ নম্বর শূন্য। ঘন-ঘন কটাক্ষপাত করলে সে, ইংরেজ ও বাঙালি, ফিরিঙ্গি ও পার্সি মেয়ে-পুরুষ অনেক ঢুকলো, কিন্তু ঐ চেয়ারটিতে কেউ বসলো না। ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেলো, শুরু হ'লে নিউজরীল, এখনো অনেকে ঢুকছে, কিন্তু তার পাশে এসে কেউ বসলে না। তিরিশ নম্বরের টিকিট বিক্রি হ'য়ে গেছে, সন্দেহ নেই; কে জানে কোন রূপসী তরুণী তারই আশায় আজ আসবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

'মজা তো মন্দ নয়,' নবকান্ত মনে-মনে বললে।

একটু পরে ভাবলে: 'স্ত্রীলোক যে সন্দেহ নেই। তা না হ'লে এত দেরি করে!'

আর-একটু পরে ভাবলে: 'ইচ্ছে ক'রেই দেরী করছে। আমার কৌতুহল অসহ্য হোক এই তার ইচ্ছা।'

কিন্তু মোটামুটি শান্তভাবেই একটা সিগারেট ধরিয়ে সে ছবি দেখতে লাগলো। অলিম্পিক খেলা, স্পেনের বিপ্লব, আবিসিনিয়ার বিতাড়িত

রাজা—আরে, এ যে দেখছি বুড়ো বার্নার্ড শ। কী সুন্দর কথা লোকটার। তারপর শুরু হ'লো 'ব্লু এক্সপ্রেস্', মনে হচ্ছে যেন উঁচু কেলাশের গোয়েন্দা গল্প। দেখা যাক। নবকান্ত 'নড়ে'-চড়ে' ভালো হ'য়ে বসলো। প্যারিস থেকে একটি এক্সপ্রেস গাড়ি চলেছে রোমের দিকে, তারই ভিতরে ঘটছে সব। এক ইংরেজ ব্যারন, এক ইতালীয় নাট্যকার, এক ফরাশি সুন্দরী, আর ঐ কোঁৎকা জর্মানটা বুঝি নিরীহ সওদাগর। নাকি ওটাই বাটপাড় কে জানে।

কতক্ষণ সে একমনে ছবি দেখছিলো খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা অতি তীক্ষ্ণ, অতি সূক্ষ্ম গন্ধ সূক্ষ্মতম ছুঁচের মতো যেন তার মগজে গিয়ে পৌঁছলো। নবকান্তর নাকে আসছিলো প্রতিবেশী ইংরেজের পাইপের উগ্র গন্ধ, কখন যে সে-গন্ধ ছাপিয়ে উঠলো এই তীক্ষ্ণ-মধুর সৌরভ। নবকান্ত যতক্ষণে মুখ ফেরালো, ততক্ষণে একটি লম্বা ছিপছিপে মেয়ে তার পাশের চেয়ারটিতে ব'সে পড়েছে।

আবছা অন্ধকারে ভালো ক'রে কিছু দেখা গেলো না। শুধু মেয়েটির বসবার ভঙ্গিটি, কাঁধের ঢালু রেখা, শাড়ির রুপালি আভা, আর অস্পষ্ট অদ্ভুত আধখানা মুখ, যেন ধূপের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখা। আর নবকান্তর নাকে সেই তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম গন্ধ, আর তার চোখে স্বপ্নের মতো এই মূর্তি, যেন কোনো রূপকথার বই থেকে একটা ছেঁড়াপাতা।

নবকান্ত একবার ফিল্মের পরদার দিকে তাকালো, একবার মেয়েটির দিকে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে একে সে চেনে না। কখনো ভাখেনি। মেয়েটি কিন্তু সোজা পরদার দিকেই তাকিয়ে, আশে-পাশে আর যে তার কিছু লক্ষ্য করবার থাকতে পারে তা যেন সে জানেই না।

কিন্তু কথা বললে মেয়েটিই প্রথম। অত্যন্ত চাপা, অত্যন্ত মৃদু একটা স্বর নবকান্তর কানে এসে লাগলো : 'আপনি তাহ'লে এসেছেন?'

নবকান্ত কী বলবে ভেবে পেলো না।

একটু পরে মেয়েটিই আবার বললে, 'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'এখনো বলতে পারিনে,' নবকান্ত জবাব দিলে।

'আমি মলিনা।'

'মলিনা!'

ঠিক এই সময়ে এক সমবেত উচ্চহাস্যে প্রেক্ষাগৃহ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। ছবির নাটকে একটা খাঁটি ইংরেজ রসিকতা শুড়শুড়ির ঢেউ তুলে দিয়ে গেলো। কর্তব্যবোধে নবকান্ত পরদার দিকে একবার তাকালো, কিন্তু গল্প ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে চ'লে গেছে। বই তো নয় যে পাতা উল্টিয়ে দেখবে।

'তাহ'লে চিনতে পেরেছেন?' খানিক পরে আবার সেই সূক্ষ্ম ফিস্‌ফিসানি শোনা গেলো।

'না তো। পারিনি চিনতে।'

'মলিনা ব'লে কাউকে কখনো চিনতেন না?'

'না।'

'ভেবে দেখুন।'

'ভেবে দেখেছি।

'কী আশ্চর্য!'

কথাটার মানের মোড় ফিরিয়ে বললে নবকান্ত, আশ্চর্যই বটে।

পার্শ্ববর্তী ইংরেজ তার শক্ত কলারে আবদ্ধ প্রকাণ্ড ঘাড়টা ইঞ্চিখানেক

ঘুরিয়ে এক চোখে একবার ওদের দিকে তাকালো। নবকান্ত মলিনার দিকে ফিরে এক তর্জনী রাখলো ঠোঁটের উপর।

তবু খানিক বাদেই মলিনা আবার বললে : 'ছবিটা কেমন লাগছে ?'

'দেখছি না।'

'আমিও না। তাহ'লে চলুন।'

'কোথায় ?' চারদিকে জ্বলজ্বলে লাল অক্ষরে Silence please লেখা—নবকান্ত এর বেশি কিছু বলতে ভরসা পেলো না।

'চলুন। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

নবকান্ত অবাক হ'লো না, অবাক যা হবার একেবারেই হয়েছে। এসেছে যখন, শেষ পর্যন্তই দেখবে। কিন্তু এই ছবির মাঝখানে উঠে যায় কী ক'রে ? অবশ্য তারা এক ধারে আছে, কারো হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হবে না, কারো জুতোও মাড়িয়ে দেবার ভয় নেই—তবু, যাতে সকলের চোখে পড়ে এমন কিছু করা তার অভ্যেসই নয়।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আবার শোনা গেলো, 'কই, যাবেন না ?'

'ইণ্টার্ভেলের আলো জ্বলুক।'

'না, এখনই চলুন। অনে—ক কথা আছে।'

বেশি বাক্‌বিতণ্ডা করার চাইতে উঠে পড়াই ভালো মনে করলো নবকান্ত। যথাসম্ভব নিঃশব্দে অপসৃত হ'লো দু'জনে ড্রেস্‌-সার্কলের অর্ধচন্দ্র থেকে।

বাইরের আলোয় নবকান্ত এতক্ষণে ভালো ক'রে দেখতে পেলে এই রহস্যময়ীকে। দেখতে সে ভালোই, রং যেটুকু মেখেছে বেমানান হয় নি। রুপোলি জরি-বসানো জরজেট ঝলমলিয়ে কাঁপছে যেন তার প্রতি নিঃশ্বাসে।

কানে ঝুলছে জমানো আলোর মত হীরে, আঙুলের আংটিগুলোর পাথরে-পাথরে চলেছে দীপ্তির প্রতিযোগিতা। জুতোর খুরটা আড়াই ইঞ্চি অন্তত উঁচু। নবকান্তর চোখ প্রথম দৃষ্টিতে ধাঁধিয়ে গেলো, তবু তার অভিজ্ঞ চোখে এটা ধরা পড়লো যে মেয়েটির বয়স হঠাৎ যত কম মনে হবে, তত কম কখনোই নয়। পঁচিশ হবে—কি সাতাশ। সে কোন শ্রেণীর মেয়ে তা নির্ণয় করার শ্রেষ্ঠ উপায় তা'র অঙ্গরাগ নয়, তার মুখ—কিন্তু সে-মুখের উপর বিশ্লেষণের আলো ফেলেও নির্দ্দিষ্ট কিছু বোঝা গেলো না। বোঝা গেলো এইটুকু যে এ-মুখের উপর নবকান্ত এর আগে কোনোদিন চোখ রাখেনি।

'তাহ'লে চলুন আমার ওখানে,' মলিনা বললে।

'আপনার—?'

'আহা, আমাকে আবার আপনি বলছেন কেন? আমি কত ছোটো আপনার। সর্বতোভাবে ছোটো!'

'বেশ, তুমিই বলবো।' সমস্ত ঘটনার মধ্যে এটাও অনায়াসে মেনে নিলে নবকান্ত।

রাস্তায় নেমে এসে মলিনা বললে, 'কষ্ট ক'রে আপনাকে একটুখানি হাঁটতে হবে।'

'আপনি—তুমি কাছেই থাকো বুঝি।'

পরমুহূর্ত্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে নবকান্ত লজ্জিত হ'লো। সারবন্দী হ'য়ে অনেকগুলো গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে যেটা সব চেয়ে জমকালো সেটার কাছে দু'পা হেঁটে গিয়ে থামলো ঐ মেয়ে। উর্দি-আঁটা শোফর বিরাটভাবে দরজা খুলে দিলে।

খাতার শেষ পাতা

'দয়া ক'রে উঠুন,' মলিনা বললে।

'নিশ্চয়ই দয়া করবো,' ব'লে নবকান্ত হাসলো। গাড়ির পালকের গদিতে শরীরটা যেন গ'লে গেলো তার। সে গরিবের ছেলে নয়, ধনী বন্ধু-বান্ধবও আছে, কিন্তু সত্যিকার রোলস্ রয়েসে চড়া জীবনে এই তার প্রথম। নিশ্চয়ই দয়া করবে সে।

গাড়িটা নিউ এম্পায়ারের গলি থেকে বেরোতেই মলিনা বললে: 'তুমি সিগারেট খাও?—ছি-ছি আমিও তুমি ব'লে ফেললাম।'

'তাতে কী? ভালোই তো,' নিঃশব্দ রোল্‌সের রাজকীয় আরাম উপভোগ করতে-করতে নবকান্ত বললে।—'হ্যাঁ, খাই।'

'তাহ'লে খেতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

নবকান্ত সিগারেট ধরালো। রোলস্ চললো ধরমতলার দিকে।

একটু পরে মলিনা বললে: 'ক'টা বাজলো?'

নবকান্ত তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে: 'স'দশটা।'

'স'দশটা!' মলিনা যেন আঁৎকে উঠলো, 'তাহ'লে আর তো সময় নেই।'

'কিসের সময়?' বিলাসিতার নেশায় আচ্ছন্ন নবকান্ত অলসভাবে প্রশ্ন করলে।

'না, আর সময় নেই,' অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে মলিনা ব'লে উঠলো। 'কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-দশটায় সে আসবে।'

'কে আসবে?'

নবকান্তর একটু কাছে স'রে এসে, তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে

মলিনা রুদ্ধস্বরে বললে : 'সে-সব পরে শুনবে। কিন্তু তুমি যে আমা
বিয়ে করেছিলে তা কি একেবারে মনে নেই ?'

চমকে সোজা হ'য়ে উঠে বসলো নবকান্ত, পালকের গদি মুহূর্তে কাঁটা
মতো ফুটতে লাগলো। মেয়েটা কি পাগল ? কিন্তু এত হীরে, আর
রোলস্! হয়তো কোনো উন্মাদ রাজকন্যা, নিরীহ সাধারণ বেচারা
উপর নিজের ভয়ানক খেয়ালগুলো মেটায়। এ রকম দু'একটা
পড়েছে সে, শুনেওছে। অলক্ষ্যে তার হাতের তেলো ঘেমে উঠলে
মলিনা আরো একটু কাছে এসে আদরের মতো স্বরে জিজ্ঞেস করলে
'একেবারেই মনে পড়ছে না ?' সেই তীক্ষ্ণ গন্ধের হঠাৎ-ঝাপ্‌টায় নবকা
নিঃশ্বাস প্রায় আটকে এলো।

গাড়ি ততক্ষণে ছুটেছে ধরমতলা দিয়ে। চকিতে নবকান্ত স
অবস্থাটা একবার ভেবে নিলে। চল্‌তি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে
অসম্ভব, চেঁচামেচি করা আরো বেশি অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত যেতেই হ
তারপর বুদ্ধির জোরে আত্মরক্ষা। মাথা ঠিক রাখাই এখন সব চেয়ে ব
কথা।

তাই সে মুখে কোনোরকম বৈলক্ষণ্য না-দেখিয়ে বললে, '
মনে পড়ছে বইকি।' যদি মেয়েটা পাগল হয়, তাহ'লে তার তালে-ত
চলা ছাড়া উপায় নেই; আর যদি হয় ধূর্ত শয়তানি, তাহ'লে প
ধূর্ততাই তো দরকার।

'কেমন! বলিনি আমি!' হালকা হাসির সুরে ব'লে উ
মলিনা। 'তবে তখন কেন বলেছিলে আমায় চেন না ?'

'কী জানি কেন!' নবকান্ত আর কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে বল

'জেনে-শুনে অমন মিথ্যেটা বললে কেন তখন?' হাসতে-হাসতে মলিনা প্রায় এগিয়ে পড়লো। 'আচ্ছা, তুমি তো আমাকে তেমনি ভালবাসো, বাসো না?'

অলক্ষিত একটু দূরে স'রে বসলো নবকান্ত, দুরদুর্ করছে তার বুক, রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঝাপসা দেখছে। ততক্ষণে গাড়ি প্রায় ধরমতলার পুব প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। অনেকটা নিরিবিলি হ'য়ে এসেছে পথ-ঘাট, ট্রাম থেমে গেছে, ফিরিঙ্গিপাড়ার যেটা বিশেষ লক্ষণ সেই ফীটন্ গাড়ী প্রায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ঘোড়ার মন্থর খট-খট শব্দ ক'রে।

মলিনা আবার বললে: 'না হয় ছেড়েই গিয়েছিলে, তাই ব'লে সত্যি তো আমাকে ভোলোনি। সত্যি-সত্যি আমাকেই তো ভালোবাসো। আমাকে কেউ কেড়ে নিতে চাইলে প্রাণ দিয়ে আমাকে বাঁচাবে—বাঁচাবে না?' বিহ্বল চোখে নবকান্তর দিকে তাকিয়ে মলিনা তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে, নবকান্ত কোণ ঘেঁসে যতটা সম্ভব জড়োসড়ো হ'য়ে বসলো। পাগল, বদ্ধ পাগল!

'ওগো, কিছু বলো! এই তো আমরা এসে পড়লুম। বলো তুমি। আমাকে বাঁচাবে তো? বাঁচাবে তো?' মলিনার বড়ো-বড়ো কালো চোখে এমন অসহায় করুণ মিনতি ফুটে উঠলো যেটা অবিশ্বাস করা অসম্ভব। 'ম্যাখো, আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি! এই তো এসে পড়লাম—হায়রে!'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মলিনা জোর ক'রেই তার সঙ্গীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ঢুকলো লোয়ার সার্কুলর রোডের উপর এক বাড়িতে—প্রাসাদ বললেই ঠিক হয়। প্রকাণ্ড

বাড়ি, মস্ত কম্পাউণ্ড—কিন্তু একেবারে চুপচাপ। এবারে সত্যি-সত্যি ভ
নবকান্তর বুক শুকিয়ে গেলো। গাড়ি থেকে নেমেই দৌড় দেবে, চীৎক
দেবে, যা-হোক কিছু করবে এমন শক্তিও তার নেই। সেই প্রকা
অন্ধকার বাড়ির দিকে তাকিয়ে গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরোতে চায় না

কিন্তু গাড়ি থামবার সঙ্গে-সঙ্গেই বারান্দায় ও ভিতরে আলো জ্ব'
উঠলো, বেরিয়ে এলো চাকর-বাকর, বাড়ির ভিতরেও নিঃশব্দ ক্ষিপ্রত
আভাস পাওয়া গেলো। মলিনা মৃদুস্বরে বললে, 'এসো।'

সম্মোহিতের মতো নামলো নবকান্ত গাড়ি থেকে, সম্মোহিতের মে
মলিনার পিছন-পিছন উঠে গেলো উপরে। সামনের যে-ঘরটিতে আে
জ্বলছে অত বড়ো আর অত সুন্দর ড্রয়িংরুম নবকান্তর চোখে কখে
পড়েনি। এক কোণে পাখার নিচে ব'সে পড়লো মলিনা, সেই সোফা
এক অংশ দখল করতে হ'লো নবকান্তকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ভৃত্য এলো রুপোর ট্রেতে ছোট-ছোট গেলাশ সাজিয়ে
না, না, তাহ'লে তো পাগল নয়। এই রোল্‌স্, এই বাড়ি, এই মহামূ
সম্ভ্রান্ত পানীয়···তা এর কারবার তো বাঘ সিঙ্গি নিয়ে, তার মধ্যে
অভাজনের উপর এই অদ্ভুত করুণা কেন আজ?

কিন্তু নবকান্ত আরো একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেলো, যখন মেয়ো
অত্যন্ত প্রকৃতিস্থ এবং অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললে: 'দয়া ক'রে আমা
আতিথেয়তা একটু গ্রহণ করুন।'

আতিথেয়তা যখন টলটলে অম্ল-মধুর শ্যাম্পেনের রূপ নিয়ে আবির্ভূ
হয়, তা গ্রহণ করা নবকান্তর পক্ষে খুবই সহজ। মাথা নিচু ক'রে
মৃদু হেসে সে বললে: 'অনেক ধন্যবাদ।'

৩

মেয়েটি বললে: 'সাড়ে-দশটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। খুব তাড়াতাড়ি।' এ-বাড়িতে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গে তার হাব-ভাব কথাবার্তা সব একেবারে বদলে গিয়েছিলো। 'তাড়াতাড়িতে আপনাকে দু'একটা কথা ব'লে নিই।'

'শুনে কৃতার্থ হবো', নতুন সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নবকান্ত বললে।

'প্রথম কথা হচ্ছে আমার নাম মলিনা নয়।'

'সেটা বুঝতে পেরেছি।'

'আমি অভিনেত্রী—'

'সেটাও বলা বাহুল্য।'

'সিনেমার অভিনেত্রী আমি, আমার আসল নাম বললে আপনি নিশ্চয়ই চিনবেন। আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন কিনা জানিনে।'

নবকান্ত নির্লজ্জের মতো বললে: 'পারিনি। সিনেমা একেবারেই দেখিনে, আর সিনেমার কাগজগুলো—'

'তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আপনারা বিদ্বান, আপনারা কি পারেন ও নিয়ে সময় নষ্ট করতে। সে যা-ই হোক্, নিজের মুখেই বলতে হচ্ছে যে অভিনয় ক'রে আমার যশ ও অর্থ দু-ই হয়েছে। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কতই সুখী—' নবকান্তর মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে মেয়েটি নিজে শুধরে নিলে—'আপনি না-ভাবলেও লোকে তো ভাবে, কিন্তু সত্যি আচ্ছা

আমার মতো দুঃখী এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরে আর একটি লোকও নেই।'

'সত্যি ?' নবকান্তর কথার সুরে একটু যেন বিদ্রূপ।

'ঝাড়গ্রামের রাজার নাম শুনেছেন ?'

'না।'

'নাম তাঁর রূপবল্লভ, বল্লভ রায় ব'লে জানে সবাই। এই যে দেখছেন বাড়ি আর গাড়ি, এত জিনিস, এত চাকর-বাকর—সবই তাঁর আমি—'

নবকান্ত মাথা ঝেঁকে তৎক্ষণাৎ বললে : 'বুঝেছি।'

'কিন্তু একটা কথা। আমি প্রায় এক বছর ধ'রে তাঁর আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু···কিন্তু তিনি যা চান তা এখনো পাননি।'

নবকান্তর ঠোঁটে একটু চাপা হাসি খেলে গেলো। আবার বললে, 'সত্যি ?'

'সত্যি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'

'প্রথমটা করা গেলো, দ্বিতীয়টা করবো কোন্ উপায়ে ?'

'কিন্তু বল্লভ রায় কিছুতেই আমাকে রেহাই দে না। 'জানেন, খুব অন্তরঙ্গসুরে মেয়েটি বলতে লাগলো, 'আমি কত চেষ্টা করেছি পালাতে, কত কেঁদেছি, হাতে-পায়ে ধরেছি, কিন্তু ও লোকটা পাষাণ এই শূন্য পুরীতে এত চাকর-বাকর কেন ? আমাকে পাহারা দিতে হয়, ওর নজরের বাইরে এক মুহূর্ত আমার যাবার উপায় নেই—'

মৃদু হেসে নে—?'

খাতার শেষ পাতা

নবকান্তর প্রশ্নটা আগেই বুঝতে পেরে অভিনেত্রী বললে: 'তাই ব'লে সিনেমায় কি আর যেতে না পারি! তাই ব'লে রাজার বন্ধুকে কি আর বাড়িতে আনতে না পারি! আমি তো এটুকু কৌশল করলুম, বাকিটা আপনার দয়া।'

'আমাকেও একটু অভিনয় করতে হবে মনে হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছেন। শুনুন, বল্লভ রায় কাল আমাকে শাসিয়ে গেছে, জানিয়ে গেছে তার শেষ কথা। আজ কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-দশটায় সে আসবে। আজ ঐ অসুরটা...' শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো ভূতপূর্ব মলিনা।

একটু পরে হাত সরিয়ে বললে, 'সময় নেই, কথাটা শেষ ক'রে ফেলি দেখুন, অনেক ভেবে এই উপায়টা আমি বের করেছি। আপনি আমার স্বামী। আপনার সঙ্গে আমার পাঁচ বছর আগে বিয়ে হয়েছিলো, কিন্তু আপনি আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। এখন আপনি এসেছেন আমাকে ফিরিয়ে নিতে—যেমন ক'রে পারেন, আমাকে নিয়ে যাবেনই।'

'বুঝেছি। কিন্তু রাজামশাই যদি কান না দেন আমার কথায়? যদি হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখেন। যদি পুলিশে ধরিয়ে দেন?'

'পাগল! অতই সোজা কিনা! বিয়ে হয়েছে, তার উপর আবার কথা আছে নাকি? দেখুন, আপনি আমাকে রক্ষে না-করলে আমি বাঁচবো না।' মেয়েটির চোখ প্রায় ছল্ ছল্ ক'রে এলো, ঢোঁক গিলে সে চুপ ক'রে গেলো।

এতক্ষণে নবকান্তর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে মনে পড়লো। 'আচ্ছা

বলুন তো, কলকাতায় এত রকমের এত লোক থাকতে আমাকেই কে আপনি—'

কিন্তু তার কথাটা শেষ হবার আগেই একটা ঘড়িতে ঢং ক'রে সাড়ে-দশটা বাজলো। মেয়েটি চমকে উঠলো, অস্ফুট একটা চীৎকার বেরুলো তার মুখ দিয়ে। নিচে থেকে শোনা গেলো একটা গাড়ি থামবার মৃদু আওয়াজ।

'আর উপায় নেই,' চরম হতাশের ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে মেয়েটি ব'লে উঠলো: *'আপনি এখন আমাকে না-বাঁচালে আর উপায় নেই।'*

সে উঠে দাঁড়ালো, নবকান্তও দাঁড়ালো সেই সঙ্গে। সামনে প্রকাণ্ড লম্বা একটা আয়নায় দু'জনের সম্পূর্ণ ছায়া পড়েছে। হঠাৎ সেখানে পড়লো আরো একজনের ছায়া, আর সঙ্গে-সঙ্গে নবকান্তর চোখ দুটো গোল হ'য়ে উঠে যেন কোটর থেকে বেরিয়ে এলো, তার নিঃশ্বাস জোরে-জোরে পড়তে লাগলো, মাথা ঘুরে উঠলো, পায়ের নিচে শ্বেতপাথরের মেঝে ট'লে উঠলো, কেননা ঝাড়গ্রামের রাজা আর-কেউ নয়, তারই বন্ধু বিজয়।

৪

প্রকাণ্ড ভোজগৃহ কাচে আর রূপোয় আর বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে। সেখানে ব'সে ভোজনের প্রারম্ভে বিজয় বললেঃ 'সারপ্রাইজটা কেমন লাগছে, নবকান্ত?'

নবকান্ত বললে, 'ওভারভোজ হ'য়ে গেছে। মাথা ঘুরছে।'

মেয়েটি মৃদু হেসে বললেঃ 'সময়টা ভোজনের অনুকূল নয়, তবু আমাদের আতিথেয়তা একটু গ্রহণ করুন।'

'ভালো ক'রেই করবো। খিদে পেয়েছে তুমি তাহ'লে রেঙ্গুন যাওনি, বিজয়?'

'দেখতেই তো পাচ্ছো। মনে একটু ভয় ছিলো পাছে তুমি ভালো ক'রে ডাকঘরের ছাপ লক্ষ্য করো।'

'সত্যি কি তুমি ঝাড়গ্রামের রাজা?'

বিজয় মুচ্‌কি হাসলো।

'ঝাড়গ্রামের রাজা এখন সুইৎসর্লাণ্ডে পাহাড়ের হাওয়া খাচ্ছেন। এই বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি অবশ্য তাঁরই, তিনি দয়া ক'রে আমাদের ধার দিয়েছেন।'

নবকান্ত বললে, 'ও।'

'তিনি আমার দাদা,' মেয়েটি বললে।

নবকান্ত দ্বিতীয়বার বললে, 'ও।'

খাতার শেষ পাতা

বিজয় বললে, 'আমার স্ত্রী মলিনার সঙ্গে তোমার তো আগেই আলাপ হয়েছে' 'তবু এই যেন প্রথম আলাপ।' চেয়ার থেকে একটু উঠে খুব ঘটা ক'রে নমস্কার ক'রে নবকান্ত বললে: 'আপনার সঙ্গে পরিচয়ে কৃতার্থ হলুম।'

বিজয় বললে: 'আর একটা কথা বোধ হয় বলা দরকার। আমাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র দিন সাতেক, সেই সময়টাতেই আমি রেঙ্গুনে রওনা হয়েছি। বুঝলে না?'

'বুঝেছি।'

'এটা অভিনব বিবাহ-ভোজ ব'লেও ধরতে পারো।'

" 'জানো আমার সকল কাজেই ওরিজিনালিটি'," মলিনা আবৃত্তির সুরে বললে।

'আইডিয়াটা ছিলো এই রকম। মলিনাকে বললুম—বিয়ে তো করলুম চুপি-চুপি, এখন নবকান্তকে অন্তত খবরটা দিতে হয়। তখন দু'জনে মিলে এই গল্পটা ফাঁদলুম। কত গল্প লিখেছে কত লোক, গল্প কেউ বেচেছে?'

'যদি না অনিচ্ছায়, যদি না অজান্তে,' বললে নবকান্ত।

বিজয় মাথা নেড়ে বললে, 'সে নয়, সে নয়। যেমন লেখিয়েরা গল্প বানায়, তেমনি গল্প বানানো—লেখা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে, সত্যিকারের ঘটনা দিয়ে। কখনো করেছে কেউ?'

'এ-পর্যন্ত শুনিনি,' নবকান্তকে স্বীকার করতে হলো।

'অবিশ্যি আমাদের এই গল্প গোড়াতেই মারা যেতো যদি তুমি না আসতে। তুমি যে কষ্ট করে এসেছো সেজন্য ধন্যবাদ।'

খাতার শেষ পাতা

'গল্পটা আমার কাছে আগাগোড়াই মজার অবিশ্যি হয়নি,' নবকান্ত হেসে উঠলো।

মলিনা বললে: 'এ-রকম গল্প মাঝে-মাঝেই ঘটানো যায়, অন্যের লেখা গল্প পড়ার চাইতে এ কত বেশি থ্রিলিং!'

'নিশ্চয়ই' বিজয় জোর দিয়ে বললে। 'কালক্রমে একটা জীবন্ত-রোমান্স-সংসদ কি প্র্যাকটিক্যাল্ থ্রিলর ক্লব কি ঐ গোছের একটা গুপ্ত সমিতি করলে হয়। তুমি মেম্বর হবে তো নবকান্ত?'

১৩৪৩